

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যতাসমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা ইয়াছমিন

রোলঃ 23090120857

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্যতাসমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা ইয়াছমিন

রোলঃ 23090120857

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্যতাসমূহ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফসানা ইয়াছমিন, আইডিঃ 23090120857 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারায়াত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্যতাসমূহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আফসানা ইয়াছমিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

আফসানা ইয়াছমিন

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090120857

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দীন.....	5
ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন	6
ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, সকল মানুষের ধর্ম.....	7
বিজয়ী ধর্ম ইসলাম	11
ইসলাম শান্তির ধর্ম: কেন ও কীভাবে.....	13
আকীদা ও বিশ্বাসে ইসলামের সৌন্দর্য.....	17
ইসলাম নারীকে যে ভাবে সম্মানিত করেছে.....	21
জাহেলি যুগে নারীর করুণ অবস্থা.....	21
রাসূল ﷺ-এর আগমন	22
নারীও হতে পারে আল্লাহর ওলী.....	22
নারী-জীবনের বিভিন্ন ধাপে প্রতিদান ও সম্মান.....	23
কন্যাশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া: এক অপার রহমত	23
নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা.....	23
ব্যথা, আর তার বিনিময়ে সাওয়াব.....	24
সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী নারী ‘শহীদ’	24
মায়ের দুধের প্রতিটি ফোঁটায় সাওয়াব	24
মায়ের নিদ্রাহীন রাতের পুরস্কার.....	25
সংসারের কাজেও নারীর জন্য সাওয়াব	25
পাশ্চাত্য নারীবাদে নারী স্বাধীনতা নামে ধোঁকা	26
নারী-স্বাধীনতার নামে ধোঁকা	27
ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়—এই কেমন স্বাধীনতা?.....	28
অর্ধেক জনশক্তি—এই যুক্তির প্রতারণা.....	29
জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অধিকারে ইসলামের সৌন্দর্য.....	30

সামাজিকতা ও সহাবস্থানে ইসলামের বৈশিষ্ট্য	32
ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য্য	34
ধন-সম্পদ বিষয়ে ইসলামের সৌন্দর্য্য	36
আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বে ইসলামের বৈশিষ্ট্য	39
হিন্দুধর্ম ও উপত্তি	40
ঈশ্বর বা প্রভু সম্পর্কে বিশ্বাস	40
কেন হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম উত্তম?	41
খৃস্টধর্ম নিয়ে কিছু কথা	46
ত্রিত্ববাদ	46
দলীল	47
কেন খৃস্টধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম উত্তম?	48
বাইবেলে খৃস্টানদের ঈমানের উপর পাঁচ পরিক্ষা	51
খৃস্টধর্মের উপর কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের পরিক্ষা	51
এ ধরনের বিশ্বাস তাদেরকে মুক্তি দেবে না	51
ইসলামকে আকঁড়ে ধরার গল্প	52
উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	52
পরিশিষ্ট	58
রেফারেন্স	61

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। আকীদা, ইবাদত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং শিক্ষাসহ মানব জীবনের সবকিছু এই ধর্মের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। ইসলাম ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে (চিরকালের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (সূরা মায়দা: ৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

হে মু'মিনগণ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।

নিশ্চিত জেন, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাকারা: ২০৮)

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ মানব জীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং বিধিবিধান রয়েছে। ফেকাহ শাস্ত্রে খুটিনাটি সব কিছুর বিস্তারিত আলোচনা আছে। এর কিছু মান্য করা, কিছুকে অস্বীকার করা কুফরী। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

أَفْتَوْمُنُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْثُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. البقرة

তবে তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? তাহলে বল, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আযাবের দিকে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন। (বাকারা: ৮৫)

ইসলাম-পূর্ব আসমানী ধর্মগুলো সারা পৃথিবীর জন্য এবং সব যুগের জন্য ছিলো না। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেগুলোতে জীবনের সকল বিষয়ের সমাধান নেই এবং সেগুলো পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু ইসলাম এর ব্যতিক্রম।

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধীন

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ধীন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি একমাত্র এ ধর্মের মাঝে নিহিত। এরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধীন কেবল ইসলাম। (আলে ইমরান: ১৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে ধীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আলে ইমরান: ৮৫)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه، ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ، رواه احمد في مسنده جـ ٤ رقم ١٤٧٣٦ و البيهقي في شعب الايمان جـ ١ باب في الايمان بالقرآن و سائر الكتب المنزله رقم ١٧٦

যদি মুসা আ. জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হত। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস, ১৪৭৩৬ শুআবুল ইমান, বায়হাকী, হাদীস ১৭৬)

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, সকল মানুষের ধর্ম

আল্লাহ পাক বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, বিশ্বমানবের জন্য যা আদ্যোপান্ত হেদায়াত
এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে
চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়। (বাকারা: ১৮৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত
রাসূল, যার আয়ত্তে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব। (আরাফ: ১৫৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
হে নবী! আমি তোমাকে জগতসমূহের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি। (আম্বিয়া: ১০৭)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
হে মানুষ! তোমাদের কাছে এমন জিনিস এসেছে যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে
এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মু'মিনের পক্ষে হেদায়াত ও রহমত।
(ইউনুস: ৫৭)

ইসলাম মানবধর্ম। জাতি-ধর্ম বংশ-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায় বিচার, সহমর্মিতা,
সৌজন্যমূলক আচরণ, জীবের প্রতি দয়া এই ধর্মের অন্যতম শিক্ষা। কুরআনুল কারীমে
ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظَمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ
তার হকদারকে আদায় করে দিবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ইনসাফের
সাথে বিচার করবে। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি
উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনে, সবকিছু দেখেন। (নিসা: ৫৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا
নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে
উপলব্ধি দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পার। আর তুমি
খেয়ানতকারীদের পক্ষ অবলম্বন করো না। (নিসা: ১০৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُؤْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও। আল্লাহর স্বাক্ষীরূপে-যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে ব্যক্তি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার আদেশ করা হচ্ছে) যদি ধনী বা গরীব হয় তবে আল্লাহ উভয় প্রকার লোকের ব্যাপারে তোমার চেয়ে বেশী কল্যাণকামী। সুতরাং এমন খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে না, যা তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়। তোমরা যদি পেঁচাও অর্থাৎ (মিথ্যা সাক্ষ্য দাও) অথবা (সঠিক সাক্ষ্য দেওয়া থেকে) পাশ কাটিয়ে যাও। তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। (নিসা: ১৩৫)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন হয়ে যাও যে, সর্বদা আল্লাহর (আদেশসমূহ পালনের) জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং ইনসাফের সাথে সাক্ষদানকারী হবে এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশী নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে অবগত। (মায়দা: ৮)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان
হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন না। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, হাদীস ৬১৭২)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذى فى جامعه، ابواب البر و الصلة، باب ما جاء رحمة الناس

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (জীবের প্রতি) দয়াকারীর উপর দয়াময় আল্লাহ দয়া করেন। জমিনে

বসবাসকারী মাখলুকের প্রতি দয়া কর, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَلَحُّبُ الْخَلْقِ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ .
رواه البيهقي في شعب الإيمان ج 6 باب طاعة أولى الأمر فصل نصيحة الولاة

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। আল্লাহর কাছে প্রিয় সেই যে তাঁর পরিবারের প্রতি দয়া করে। (শুআবুল ইমান, বায়হাকী, হাদীস: ৭৪৪৮)

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র সত্য ধর্ম। এই ধর্ম সকলকে দরদের সাথে সত্যের পথে আহ্বান করে। ইহকালীন ও পরকালীন নাজাতের পথে ডাকে। কিন্তু কাউকে বাধ্য করে না। সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে।

ইরশাদ হয়েছে:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দ্বীন গ্রহণের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই। হেদায়েতের পথ গুমরাহি থেকে পৃথক রূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর পর যে ব্যক্তি তাওতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো সে এক মজবুত হাতল আকড়ে ধরল, যা ভেঙ্গে যাওয়ার কোন আশংকা নেই। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। (সূরা বাকারা: ২৫৬)

ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে যিনি স্বেচ্ছায় সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম আহকাম পালনে বাধ্য থাকবেন। ক্ষমতানুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বাধ্যও করবে। বনী ইসরাইল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনার পর যখন তাওরাতের হুকুম আহকাম পালনে বাহানা করে, তখন তাদের উপর পাহাড় তুলে ধরা হয়। ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
এবং সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের থেকে (তাওরাতের অনুসরণ সম্পর্কে) প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তুর পাহাড়কে তোমাদের উপর উত্তোলন করে ধরেছিলাম। (আরও বলেছিলাম যে) আমি তোমাদেরকে যা (যে কিতাব) দিয়েছি তা শক্ত করে ধর এবং তাতে যা কিছু লেখা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (বাকারা: ১৩)

হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে:

عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان . أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনও গোনাহের কাজ দেখবে শক্তি থাকলে হাত দ্বারা (বল প্রয়োগ করে) তা বন্ধ করে দিবে। এ শক্তি না থাকলে মুখ দ্বারা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। এ শক্তিও না থাকলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৭৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

عن عبد الله عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مروا أولادكم بالصلوة و هم أبناء سبع سنين، واضربوا هم عليها و هم أبناء عشر، و فرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلوة، باب متى يومر الغلام بالصلوة

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শিশুর বয়স যখন সাত বছর হয় তাদেরকে নামাযের আদেশ কর, দশ বছর হলে (প্রয়োজনে) প্রহার (হালকা শাসন) কর এবং তাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দাও। (সুনানে আবু দাউদ ৪৯৬)

মুরতাদ সম্পর্কে ইসলামী আদালতকে রাসূল সা. নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

عن ابن عباس مرفوعاً، من بدل دينه فاقتلوه. أخرجه البخارى في صحيحه، كتاب استتابة المعاندين و المرتدين، باب حكم المرتد و المرتدة

হযরত ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মুসলমান দ্বীন ত্যাগ করল তাকে মৃত্যুদন্ড দাও। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৭২২) ইসলাম কোনও অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে না। তবে একমাত্র বিজয়ী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়।

বিজয়ী ধর্ম ইসলাম

ইসলাম আল্লাহ-মনোনীত সত্য ধর্ম। সেহেতু বিজয়ী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা তার একান্ত কাম্য। সত্যের হাতে পৃথিবীর নেতৃত্ব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং অন্যায় অবিচার দূর করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, শান্তি স্থাপন এবং খোদাদ্রোহী কুফরী শক্তির দাপট চূর্ণ করে একমাত্র সত্যধর্ম ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের লক্ষ্য।

কুফরী শক্তির দাপট ইসলাম বিরোধী মানবরচিত আইনের কর্তৃত্ব যাবতীয় অশান্তির মূল। হক গ্রহণের পথে বড় বাধা। সাধারণত মানুষ বিজয়ী শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিজয়ী শক্তির সামনে নতজানু থাকে। চেতনায়-অবচেতনে তাদের অন্ধ অনুসরণ করে চলে। এবং এটাকে গর্বের বিষয় মনে করে। আজকে বিশ্বব্যাপী ইহুদী-নাসারাদের দাপটের প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতির প্রতি চোখ বুলালেই তো বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হকের দাওয়াত যথাযথ কার্যকর হয় না। হককে বোঝা ও মানা অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই জিহাদের মাধ্যমে কুফরী শক্তিকে পদানত করে ইসলামকে বিজয়ী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বলে স্বীকার করে না তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। যাবৎ না তারা অধীন হয়ে জিযিয়া আদায় করে। (সূরা তাওবা ২৯)

অর্থাৎ তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নেওয়ার পর ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

আরো ইরশাদ হয়েছে:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

আল্লাহ তো হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন। মুশরিকগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক। (তাওবা: ৩৩)

হাদীস শরীফে জিহাদের পরিচয় ও লক্ষ্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابُ الْعِلْمِ،
بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল এ লক্ষ্যে, যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয় সেই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করল। (সহীহ বুখারী হাদীস, ১২৩০)

আরো ইরশাদ হয়েছে:

الإسلام يعلو لا يعلو. أخرجه البخارى تعليقا فى صحيحه كتاب الجنائز- باب إذا أسلم الصبى فمات، هل يصلى عليه الخ و أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى موصولا و مرفوعا بسند حسن ج٦، ص ٢٠٥ باب من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدها

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলাম বিজয়ী দীন পরাজিত নয়।

(সহীহ বুখারী হাদীস: ১৩৫৩; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৬/২০৫)

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রাহ.) তাঁর এক মকতুব (চিঠিতে)-এ লিখেছেন:

از آنجا که دعوت لسان بدون انضمام جهاد سيف و سنان کامل و تمام نمی گردد، لهذا امام هاديان و رئیس داعیان یعنی سید ولد عدنان علیه الصلاة والسلام آخر کار بقتال کفار مامور گردیدند و ظهور شعائر دین متین و علو اعلام شرح متین از اقامت این رکن رکن صورت بست.

অর্থাৎ যেহেতু মৌখিক দাওয়াত অস্ত্রের জিহাদ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে না, তাই সকল দায়ীর ইমাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ পর্যায়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। শা'আয়েরে দ্বীনের মর্যাদা, শরীআতের বিজয় ও উন্নতি জিহাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (সীরাতে সায়েদ আহমদ শহীদ।

অতএব শান্তি স্থাপন এবং ন্যায় ও সত্যকে বিজয়ী রাখার লক্ষ্যে সামর্থ অনুযায়ী জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা মুসলমানদের উপর ফরয। যা পালন করা প্রথমত মুসলিম শাসক ও প্রশাসনের কাজ। (আবদুল্লাহ, 2013)

ইসলাম শান্তির ধর্ম: কেন ও কীভাবে

‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’ কথাটি মুসলিম মাত্রেই মনের কথা এবং অতি সত্য ও বাস্তব কথা। তবে বহুল উচ্চারিত অনেক সত্য কথার মতো এ কথারও মর্ম ও বিস্তৃতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ, সঠিক কথারও ভুল বা অসম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে। কুরআন মাজীদে আলকুরআনের তথা ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَ يَعْزِفُ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

...তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এ দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন নিজ ইচ্ছায়। আর তাদের পথ দেখান সরল পথ। -

সূরা মাইদা (৫): ১৫-১৬

এ আয়াতে ‘সালাম’ শব্দ আছে। সাধারণত ‘সালাম’ শব্দের অর্থ করা হয় ‘শান্তি’। এ অর্থ ভুল নয়, তবে সূক্ষ্ম অর্থ হচ্ছে ‘মুক্তি’। বিপদ ও অশান্তি থেকে মুক্তিই তো শান্তির বড় উপায়। ইসলাম মানুষকে বিপদ ও অশান্তি থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই ইসলাম শান্তির ধর্ম।

ইসলামের কিতাব আলকুরআন মানুষকে নাজাতের পথ দেখায়। কী থেকে নাজাতের? প্রথমত আখিরাতের মহা বিপদ থেকে নাজাতের। ইসলামী আকীদার এক প্রধান বিষয় আখিরাতে ঈমান এবং ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার গোটা ব্যবস্থাটিই তাকওয়া (খোদাভীতি) ও ঈমান বিল আখিরাহ (আখিরাতের উপর ঈমান)-এর উপর ভিত্তিশীল। তেমনি ইসলামী দাওয়াতের প্রধান অংশ আখিরাত ও আখিরাতের নাজাত। ইসলামের নবী, বিশ্ব মানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল আখিরাত এবং তাঁর গোটা জীবনের সফল সমুজ্জ্বল বিস্তৃত ও বিচিত্র দাওয়াতী কর্মতৎপরতার অন্তর্নিহিত ঐক্যের সূত্রটি ছিল আখিরাত। ইসলামের আকীদা-প্রসঙ্গ হোক বা ইবাদত, লেনদেন হোক বা সামাজিকতা, স্বভাব-চরিত্র হোক বা আচার-আচরণ, সৎকাজের আদেশ হোক বা অসৎকাজের নিষেধ এককথায় মানবজীবনের সব বিষয়ে ইসলামের যে বিশ্বাস ও বিধান তা গ্রহণ ও অনুসরণের মূল প্রেরণা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের নাজাত। এ কারণে ইসলামের করণীয়-বর্জনীয় সকল বিষয়ের সাথে যে পরিভাষাগুলো জড়িত তা হচ্ছে ছওয়াব ও গুনাহ, জান্নাত ও জাহান্নাম, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি। ইসলামের কোন শিক্ষাটি এমন যেখানে পাপ-পুণ্যের, জান্নাত-জাহান্নামের এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রসঙ্গ নেই?

ইসলামী দাওয়াতের শিরোনাম-বাক্য যদি হয় ‘আল্লিম তাল্লাম’ ‘ইসলাম কবুল কর নাজাত পাবে।’ তাহলে এই নাজাত প্রধানত আখিরাতের নাজাত। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের অন্যতম উদ্দেশ্য যদি হয়- ‘ইন্নী নায়ীরুল লাকুম বাইনা ইয়াদাই আযাবিন শাদীদ’ (আমি এক কঠিন আযাবের পূর্বে তোমাদের হুঁশিয়ারকারী।) তাহলে এই আযাব প্রধানত আখিরাতের আযাব। সুতরাং ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’- কথাটির প্রধান মর্মবাণী আখিরাতের নাজাত ও শান্তি। অর্থাৎ ইসলাম ঐ ধর্ম যা আখিরাতের নাজাত ও শান্তির পথ প্রদর্শন করে। বরং একমাত্র ইসলামই ঐ ধর্ম যার মাধ্যমে আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে।

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন কবুল করতে চাইলে তার নিকট থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা আলে ইমরান (৩): ৮৫

এই মর্ম বিস্মৃত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ অর্থ অনুসারে ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’ কথাটিতে বিশ্বাসের দাবি, আখিরাতে নাজাতের যে পথ ইসলাম দেখায় সেই পথের পথিক হওয়া। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আপন আকীদা-বিশ্বাস দুরন্ত করা, আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কে জানা ও তা আদায় করা, সব রকমের গোনাহ ও পাপাচার থেকে এবং আল্লাহর হক ও বান্দার হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাম-নির্দেশিত পথে থেকে আখিরাতের চিরস্থায়ী শান্তির উপযুক্ত হওয়া।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলাম কি শুধু আখেরাতের মুক্তির পথই প্রদর্শন করে? পার্থিব শান্তির উপায় নির্দেশ করে না? করে। ইসলাম পার্থিব শান্তি ও কল্যাণের পথও নির্দেশ করে। আর এ হচ্ছে ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’ কথাটির বিস্তৃত মর্মের দ্বিতীয় অংশ। শুরুতে সূরা মাইদার যে আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে ‘সুবুলাস সালাম’ (মুক্তির পথসমূহ) শব্দবন্ধে পার্থিব মুক্তিও शामिल। এক্ষেত্রেও ইসলাম ঐ অদ্বিতীয় ধর্ম যাতে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের এবং মানবজাতির সকল শ্রেণির যথার্থ শান্তি ও কল্যাণের পথনির্দেশ রয়েছে। এটা বোঝার জন্য ইসলামের এক একটি শিক্ষা ও বিধানের যথার্থতা নিয়ে নির্মোহ চিন্তা-ভাবনাই যথেষ্ট। তাহলে দেখা যাবে ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের অনুসরণেই রয়েছে মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও প্রশান্তির নিশ্চয়তা।

কে না জানে শান্তি ও প্রশান্তির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষের মন। মনে যদি শান্তি থাকে তাহলে গোটা সত্তায় শান্তি বিরাজ করে। আর মন যদি অশান্ত হয় মানবের গোটা সত্তা অশান্তিতে আক্রান্ত হয়। মনের শান্তির একমাত্র উপায় আল্লাহর স্মরণ, তাঁর প্রতি আস্থা ও সমর্পণ এবং জীবন ও জগতের সকল বিষয়ে তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্টি। এই সম্পদ যে পেয়েছে জীবনে তার দুঃখ-কষ্ট থাকতে পারে, উপায়-উপকরণের স্বল্পতাও থাকতে পারে কিন্তু অশান্তি থাকে না।

কারণ মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে পরিতৃপ্তি ও পরিতৃপ্তি দ্বারা পূর্ণ করে দেন। আল্লাহর প্রতি আস্থার অবলম্বনে তাঁর হৃদয় থাকে ভারমুক্ত ও শঙ্কামুক্ত। পক্ষান্তরে এই সম্পদ যে পায়নি ভোগের সকল উপকরণের মাঝেও সে শান্তি খুঁজে পায় না। অশান্তির আগুনে দগ্ধ হতে থাকে। কারণ তৃপ্তি ও আনন্দ, আস্থার অবলম্বন ও ভারমুক্ততা এবং বিবেকের দংশন থেকে মুক্তির মতো শান্তির উপকরণগুলো থেকে তার হৃদয়-মন বঞ্চিত থাকে। মনের এই ক্ষোভ, অতৃপ্তি ও হাহাকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার কর্ম ও আচরণে। তার শিক্ষাহীন হৃদয়ের ঔদ্ধত্য, হিংস্রতা, কুটিলতা ও কপটতা একে একে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে এবং শুধু তাকেই নয়, তার আপনজন, প্রিয়জন, পাড়া-প্রতিবেশি, কর্তা-সহকর্মী অধীনস্ত সবাইকে সম্বলিত ও বিপদগ্রস্ত করে তোলে। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সত্য বলেছেন- ‘মানব-দেহে একটি মাংসপি- রয়েছে। যখন তা শুদ্ধ হয় গোটা দেহ শুদ্ধ হয় আর যখন তা নষ্ট হয় গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়। শোনো, তা হচ্ছে কলব (হৃদয়)।

সামষ্টিক জীবনের শান্তি নির্ভর করে পারস্পরিক অধিকার রক্ষা এবং একের অস্তিত্ব অন্যের জন্য অশান্তির কারণ না হওয়ার উপর। তাই ব্যক্তির পরিশুদ্ধি তথা মানবীয় সুকুমারবৃত্তির বিকাশ, উন্নত গুণাবলির উৎকর্ষ, মন্দ প্রবণতাসমূহের নিয়ন্ত্রণ, পরস্পরের হক ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং উত্তম পরিশীলিত আচরণ-উচ্চারণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। আখলাক ও তাযকিয়া ইসলামী শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আখলাক তথা স্বভাব-চরিত্রের পরিশুদ্ধির সাথে ইসলামে অতি বিস্তৃতভাবে রয়েছে সামষ্টিক জীবনে পারস্পরিক কর্তব্য ও অধিকারের বর্ণনা ও শিক্ষা। তাই ‘আখলাক’ ও ‘মুআশারা’ ইসলামী শিক্ষা ও জীবন-ব্যবস্থার দুই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বর্তমান বিশ্বসভ্যতার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতটা অপরিহার্য পার্থিব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ইসলামের ‘আখলাক’ ও ‘মুআশারা’র শিক্ষা তার চেয়েও বেশি অপরিহার্য। এই শিক্ষার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই সূচিত হতে পারে সামষ্টিক জীবনের শান্তি ও স্বস্তি। সুতরাং ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’- এই বিশ্বাস ও উচ্চারণের দাবি, আল্লাহমুখিতা, আল্লাহর প্রতি আস্থা ও সমর্পণ, খোদাভীতি ও আখিরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতির মতো বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি ইসলামী আখলাক ও মুআশারা তথা ইসলামী স্বভাব-চরিত্র ও সামষ্টিক জীবনের ইসলামী নীতি ও বিধানের চর্চা ও অনুশীলন।

এরপর শান্তির জন্য শুধু শিষ্টের ও শিষ্টতার লালনই যথেষ্ট নয়, দুষ্টির ও দুষ্টপ্রবণতার দমনও অপরিহার্য। তাই শান্তির ধর্ম ইসলামে রয়েছে হৃদ-কিসাস-তায়ীরের মতো নানা বিধান। রয়েছে নাহি আনিল মুনকার ও জিহাদের বিধান। এগুলো ইসলামের স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত অধ্যায়। রাষ্ট্রের ক্ষমতাশীলদের দায়িত্ব এসব বিধানের জ্ঞান যথাযথভাবে অর্জন করে সেগুলো বাস্তবায়ন করা। এই অধ্যায়ের নীতি ও বিধানের সঠিক উপলব্ধি ও যথার্থ প্রয়োগ সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা এবং ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। এমনিভাবে নাগরিকদের ফৌজদারী অপরাধের

বিচারের পাশপাশি এটাও নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, ক্ষমতাবানগণ কর্তৃক যেন এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত না হয়। হত্যা, গুপ্তহত্যা, গুম, খুনের মত অপরাধগুলো যেন কারো থেকেই সংঘটিত না হয়।। সুতরাং ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’- এই বিশ্বাস ও উচ্চারণের এক দাবি, ইসলামের নাহি আনিল মুনকারের নীতি ও বিধানের যথার্থতা উপলব্ধি এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অনুসারে এর চর্চা ও অনুশীলন।

এক কথায় ইসলাম বাস্তব অর্থে শান্তির ধর্ম। যে কেউ কোনো কিছুকে শান্তি মনে করে; ইসলামকে ঐ অর্থে শান্তির ধর্ম মনে করা ভুল। অন্যায় অনাচার, অশ্লীলতা, জুলুম-অবিচার হিংস্রতা ইত্যাদিকে কেউ যদি ‘শান্তি’ মনে করে তাহলে ইসলাম ঐ অর্থে শান্তির ধর্ম নয়। কারণ এগুলো ‘শান্তি’ নয়, নির্বিচার ইচ্ছা পূরণ মাত্র, যা দুনিয়া আখেরাতের চূড়ান্ত অশান্তির কারণ।

মুমিনের প্রতি কুরআন মাজীদের ইরশাদ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাঙ্গিকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। -সূরা বাকারা (২): ২০৮

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য, পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করা এবং জীবনের সকল অঙ্গনে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও বিধানের চর্চা ও বিস্তারে ব্রতী হওয়া। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের জীবনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করবে এবং ইসলাম শান্তির ধর্ম কথাটির সত্যতা ও যথার্থতা বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্ণ শান্তি দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন। (AlKawsar, 2016)

আকীদা ও বিশ্বাসে ইসলামের সৌন্দর্য

১। স্রষ্টা ও উপাস্যের ব্যাপারটা ইসলামে খুব স্পষ্ট। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে ইসলাম সমুজ্জ্বল বিবৃতি দিয়েছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ٤

অর্থাৎ, বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (স্বয়ংসম্পূর্ণ)। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (ইখলাস: ১-৪)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ ٢٢ (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة الحشر ٢٤)

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই,

তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনিই অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্ত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (হাশরঃ ২২-২৪)

২। ইসলাম মানুষের সৃষ্টি-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে। ক্ষণস্থায়ী জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। এ কথা স্পষ্ট করে যে, মানুষকে তার নিজের ইচ্ছামতো সৃষ্টি করা হয়নি, তাকে বেকার সৃষ্টি করা হয়নি, পৃথিবীর সংসারে কেবল পানভোজন ও বিলাস-ব্যসনের জন্য পাঠানোর হয়নি। তাকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে স্রষ্টার উদ্দেশ্য আছে। এ সংসারে আসার পর তার পালনীয় কর্তব্য আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে। (সুরা যারিয়াতঃ ৫৬)

৩। স্রষ্টার সেই উদ্দেশ্য সফল না করলে তার পরিণামের কথাও ঘোষণা করেছে ইসলাম। কর্তব্য পালন না করলে কী পরিনতি হতে পারে, সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব। (সূরা নিসাঃ ১৪)

৪। পক্ষান্তরে যারা মহান স্রষ্টার সে উদ্দেশ্য সফল করে এবং দুনিয়ায় এসে নিজেদের কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করে, তাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদেরকে বেহেস্তে প্রবেশ করা; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। (নিসাঃ ৫৭)

৫। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই এমন ধর্ম, যার অনুসারিগণ স্রষ্টার উপাসনা ও দাসত্ব করে সরাসরি তাঁরই নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে। সরাসরি তাঁরই গাইড-বুক থেকে গ্রহণ করে নিজেদের জীবন-সংবিধান। যা প্রলয়-দিবসের পূর্ব পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা নিজেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুসারে তাঁর অনুগতগণ সেই চেষ্টায় ব্রতী আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

নিশ্চয় আমি কুরআন* নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী। (হিজরঃ ৯)

৬। ইসলামই সেই ধর্ম, যা আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহর প্রেরিত বিধান। সারা সৃষ্টির মাঝে যেমন তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সারা সৃষ্টির কল্যাণের জন্য তিনি ইসলাম প্রেরণ করেছেন। যুগে যুগে সকল ধর্ম ইসলাম রূপেই সত্য ছিল। বিশ্বের প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করে তিনি তাওহীদের বাণীই প্রচার করলেন। অতঃপর তার অনুসারীরা পৃথক পৃথক নাম নিয়ে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। মহান আল্লাহ বলেন,

৭। ইসলাম একটি সহজ ও সরল ধর্ম। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ও প্রচ্ছন্নতা নেই। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির তারতমা সত্ত্বেও যে কোন মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে, গ্রহণ করতে পারে ও আমল করতে পারে।

ইসলামের বিধান উচ্চ-নিম্ন সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সমান। ইসলাম সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আসা ন্যায়পরায়ণতা ও সততার আহ্বান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَمَرَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ الْبَقَرَةُ

রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও; সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন

পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে। (বাকারাঃ ২৮৫) ৮। ইসলাম সকল আসমানী কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) এর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখাকে ওয়াজেব মনে করে। সুতরাং মুসলিমরা কোন আসমানী গ্রন্থকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে না। ইতিপূর্বে তাওরাত, ইনজীল, যবুর ইত্যাদি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস রাখে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত। (বাকারাঃ ১৩৬)

৯। ইসলাম সকল নবী-রসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রাখাকে জরুরী মনে করে। নাম জানা-অজানা কোনও নবীকে অবিশ্বাস করলে কেউ মুসলিম হতে পারে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে। (নিসাঃ ১৩৬)

১০। একমাত্র ইসলামের নবীই এমন, যাঁর জীবনের আম-খাস সকল খুঁটিনাটি তাঁর অনুসারিগণ সযত্নে সংরক্ষিত রেখেছেন। তাঁর প্রত্যেকটা উক্তি, কর্ম ও অবস্থাকে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন। যা 'সুন্নাহ'রূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎসরূপে মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করেছে।

যাঁর উক্তি ও কর্ম ছিল আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। যাঁর সুমহান চরিত্র ছিল আল-কুরআন।

১১। পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূল (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরিত হয়েছিলেন নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য, নির্ধারিত সময়ের জন্য। কিন্তু শেষনবী প্রেরিত হয়েছেন সারা বিশ্বের মানুষের জন্য, বিশ্ব ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়াঃ ১০৭)

১২। ইসলাম তার অনুসারীদের উপর প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছে। যাতে সর্বদা তারা নিজ প্রভু ও প্রতিপালকের সাথে যোগসূত্র কায়েম রাখে এবং তার মাধ্যমে পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِّرِينَ

আর তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দু' প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। (হুদঃ ১১৪)

১৩। মুসলিমদের পুন্য অর্জনের পথ অগণিত অপরিমিত। প্রতিপালকের কাছে সাওয়াবের আশা রেখে প্রত্যেক সেই গুণ বা প্রকাশ্য কথা ও কাজ করলে পুন্যলাভ করতে পারে, যাতে তিনি খুশি হন। আর প্রত্যেক পুন্য সে পরকালে হিসাবের দিন প্রত্যক্ষ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে (যিলযালঃ ৭)

১৪। ইসলামে যা বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে, তার উপর নতুনভাবে কিছু সংযোজন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাতে অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলামের আসলত্ব ধীরে-ধীরে বিলীন হয়ে না যায়। সুন্নাহর জায়গায় বিদআহ স্থান দখল করে না বসে। এই জন্য কাজ যতই ভালো মনে করা হোক না কেন, শরীয়তে তার অনুমোদন না থাকলে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। মহানবী (সঃ) বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল--- যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)

১৫। ধর্মের ব্যাপারে মতভেদ করা নিষেধ। তবুও তার ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে তিনি সকল মানুষকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তারা সদা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে যাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তারা নয়, আর এ জন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং 'আমি জ্বীন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই' তোমার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হবেই। (হুদঃ ১১৮-১১৯) (মাদানী)।

ইসলাম নারীকে যে ভাবে সম্মানিত করেছে

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা। তাদের অভিযোগ—ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন।

দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, আমাদের কি সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে?

বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান—সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই। আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে ‘পিছিয়ে পড়া’, আর অশ্লীলতাকে বলে ‘প্রগতিশীলতা’। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য—চূড়ান্ত গোলামী।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে কেউ নেক কাজ করে—সে পুরুষ হোক কিংবা নারী—আর সে যদি মুমিন হয়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই একটি সুন্দর জীবন দান করব এবং তাদের কর্মফলের উত্তম প্রতিদান তাদেরকে অবশ্যই প্রদান করব, যা তারা করে গেছে। [সূরা নাহল: ৯৭]

জাহেলি যুগে নারীর করুণ অবস্থা

ইসলামের আগে নারীদের কোনো সম্মান ছিল না। কন্যাসন্তান জন্ম নিলে লোকে লজ্জা পেত, মুখ লুকিয়ে বেড়াত। কেউ কেউ তো এতটাই পাষণ ছিল যে, নিজের মেয়েশিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত!

মেয়েদের মানুষ মনে করা হতো না। একজন পুরুষ মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পদের মতোই তার স্ত্রীকেও ছেলে বা অন্য পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত।

নারীর কথা তারা শুনত না। যদি কোনো নারী ভালো এবং যুক্তির কথা বলত, তাও তারা বলত, ‘নারীর কথা শুনলে নাকি পুরুষের মর্যাদা নষ্ট হয়।’ তাদের দৃষ্টিতে নারীর মূল্য ছিল একজোড়া পুরোনো জুতার থেকেও কম।

রাসূল ﷺ-এর আগমণ

সেই অন্ধকার যুগে যখন নারীর কোনো দাম ছিল না, তখন আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় রাসূল ﷺ পৃথিবীতে এলেন-মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, হে মানুষ! নারী তোমার লজ্জা নয়-তোমার সম্মান। সে যদি কন্যা হয়-তবে সে তোমার গর্ব। সে যদি বোন হয়-তবে সে তোমার সম্মানিত রক্ত। সে যদি স্ত্রী হয়-তবে সে তোমার জীবনের সঙ্গী। আর যদি মা হয়-তাহলে তার পায়ের নিচে আছে তোমার জান্নাত।

তিনি এমন সুসংবাদ দিলেন, যা কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

যার ঘরে দুটি কন্যাসন্তান জন্ম নেবে, আর সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে গড়ে তোলে, ভালো শিক্ষা দেয়, আদব-আখলাক শেখায়, তবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে-ঠিক যেমন দুটো আঙুল পাশাপাশি থাকে। [তিরমিযী: ১৯১৪]

তিনি আরও বললেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَّرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جَدَّتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে, আর সে তাদের বিষয়ে ধৈর্য ধরবে, খাওয়াবে, পান করাবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কাপড় পরাবে-তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হবে। [ইবন মাজাহ: ৩৬৭০]

নারীও হতে পারে আল্লাহর ওলী

আল্লাহ তাআলা নিজেও কুরআন মজিদে জানিয়ে দিলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً

যে কেউ নেক কাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়, তবে আমি তাকে পবিত্র, সুন্দর জীবন দান করব। [সূরা নাহল: ৯৭]

এই আয়াত নারীদের জন্য যেন এক শান্তির বার্তা। কেননা জাহেলি যুগ বলেছিল, নারী তুচ্ছ! কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিলেন- নারীও আল্লাহর প্রিয় হতে পারে। পুরুষের মতো নারীও হতে পারে আল্লাহর ওলী, জান্নাতি, প্রিয়তমা বান্দী। নারীর হৃদয়েও জ্বলে উঠতে পারে আল্লাহর প্রেমের দীপ্তি। নারীত্ব কোনো বাধা নয়; বরং ঈমান আর আমলই আসল পরিচয়। এভাবে ইসলাম নারীদের এমন সম্মান দিয়েছে-যা কোনো সভ্যতা, কোনো দীন, কোনো সমাজ কখনো দিতে পারেনি।

নারী-জীবনের বিভিন্ন ধাপে প্রতিদান ও সম্মান

ইসলাম নারীর প্রতি কতটা স্নেহশীল, তা বুঝতে হলে নারী-জীবনের বিভিন্ন ধাপে আল্লাহর দেওয়া সওয়াব ও পুরস্কারের কথা জানা জরুরি।

ইসলাম তাকে সম্মান দিয়েছে কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, এমনকি বৃদ্ধা হিসেবেও।

কন্যাশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া: এক অপার রহমত

ইসলাম এমন এক ধর্ম, যেখানে কন্যা শিশুর জন্মকে অভিশাপ নয়; বরং রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَوَائِهِنَّ وَضَرَائِهِنَّ وَسَرَائِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ
যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে ধৈর্যের সাথে তাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও সুখ-দুঃখ সহ্য করে লালন-পালন করবে, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে তাদের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

নবীজির পবিত্র যবান থেকে এ কথা শুনে এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন يَا رَسُولَ اللَّهِ! হে আল্লাহর রাসূল, যদি দুইটি হয়?

রাসূল ﷺ বললেন وَاثْنَانِ অর্থাৎ, দুইটিও হলে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে তাদের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আরেকজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَوَاحِدَةً? আর যদি একটি হয়? রাসূল ﷺ বললেন وَوَاحِدَةً একটিও হলে। [মুসতাদরাক হাকিম: ৪/১৭৬]

নারীর মাতৃত্বের মর্যাদা

বিয়ে-শাদির পর যখন এক মেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে সংসার শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে সে স্বামীর সাথে আনন্দঘন জীবন যাপন করতে থাকে। সংসারের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে।

একসময় আল্লাহ তাআলা তাকে মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। এই অবস্থায় ইসলামে সেই নারীর জন্য রয়েছে এক বিরাট সুসংবাদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন

أَفَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا ، وَهُوَ عَنْهَا رَاضٍ أَنْ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

তোমাদের কারো জন্য কি এই সম্মান যথেষ্ট নয় যে, যখন সে স্বামীর সন্তান ধারণ করে এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য সেই সময়টাতে সিয়াম

পালনকারী ও আল্লাহর রাস্তায় রাত্রি জেগে নামায আদায়কারীর সমান সওয়াব লিখে দেন।
[শু'আবুল ইমান: ৮২৮৮, আলমু' জাম, তাবরানী: ৬৯০৮]

ব্যথা, আর তার বিনিময়ে সাওয়াব

যখন কোনো নারী মা হওয়ার পথে থাকে, সন্তানের জন্ম যত কাছাকাছি আসে, তার কষ্টও ততই বেড়ে যায়। এক সময় সেই প্রসব যন্ত্রণায় কঠিন মুহূর্ত পার করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এই ব্যথার মাত্রা প্রায় ৫৭ ডেল! যেখানে মানুষ সাধারণত ৪৫ ডেলের বেশি ব্যথা সহ্যই করতে পারে না। তুলনা করে বলা যায়, একসাথে ২০টা হাড় ভেঙে গেলেও এর চেয়ে কম কষ্ট হয়। এই ব্যথার প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি নিঃশ্বাস-আল্লাহর কাছে অমূল্য।

এমনকি সেই সময় জান্নাতের দরজাও নারীর জন্য খুলে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
إِذَا أَصَابَهَا الطَّلُقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ فُرَّةٍ أَعْيُنٍ
যখন একজন নারীর প্রসব বেদনা শুরু হয়, তখন আসমান-জমিনের কেউ জানে না-আল্লাহ তার জন্য কী অপার আনন্দ, শান্তি ও চোখের শীতলতা লুকিয়ে রেখেছেন।
[মাজমাউজজাওয়াইদ: ৪/৩০৫]

সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণকারী নারী 'শহীদ'

যে নারী সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদের মর্যাদা পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন

وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدَةً

যে নারী গর্ভকালীন অবস্থায় বা সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। [আবু দাউদ: ৩১১১]

মায়ের দুধের প্রতিটি ফোঁটায় সাওয়াব

একজন মা যখন সন্তান জন্ম দেয়, তখন তার কষ্টের কোনো তুলনা হয় না। আর যখন সে সন্তানের মুখে দুধ তুলে দেয়, তখনও তার জন্য আল্লাহর দরবারে জমা হতে থাকে অসংখ্য নেকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন

فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا جُرْعَةٌ مِنْ لَبَنِهَا ، وَلَمْ يَمُصْ مَصَّةً إِلَّا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جُرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ

যখন কোনো মা সন্তান প্রসব করে, তারপর তার বুকের দুধের একটি ফোঁটাও সন্তান পান করলে এবং শিশুটি যখন একবার চুষে নেয়, তখন প্রতিটি ফোঁটা ও প্রতিটি চুষার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য একটি করে নেকি লিখে দেন। [শু'আবুল ইমান: ৮২৮৮]
এভাবেই মা শুধু সন্তানকে লালন-পালন করেন না; বরং প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে সওয়াবের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে চলেন।

মায়ের নিদ্রাহীন রাতের পুরস্কার

যে মা সন্তান জন্ম দেয়, সে শুধু তখনই সওয়াবের হকদার নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন
فَإِنْ أَسْهَرَهَا لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً تُعْتَقُّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
যদি সেই সন্তান কোনো রাতে অসুস্থ হয়, কান্না করে বা অন্য কোনো কারণে মাকে জাগিয়ে রাখে, আর মা ধৈর্য ধরে তাকে আদর-যত্ন করে তাহলে আল্লাহ তাআলা সেই মায়ের জন্য এমন সওয়াব লিখে দেন, যেন সে আল্লাহর রাস্তায় নিখুঁত সত্তরজন গোলাম আযাদ করেছে।
[আবু নুআইম: ৭০৮৯, মাজমাউজজাওয়াইদ: ৪/৩০৫]

সংসারের কাজেও নারীর জন্য সওয়াব

আমাদের সমাজে সব নারী-ই সংসারের কাজ করেন। ঘর ঝাড়ু দেন, কাপড় পরিষ্কার করেন, রান্না-বান্না করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটানা ঘরের কাজ সামলান। অনেকেই ভাবেন, এগুলো বুঝি শুধু দুনিয়ার কাজ। অথচ ইসলামে এসব কাজও ইবাদত, যদি নিয়ত থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে মহিলা স্বামীর ঘরের অগোছালো জিনিস গুছিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নেকি দান করবেন, তার গুনাহ মাফ করবেন।

এবার চিন্তা করুন, নারীরা প্রতিদিন কত শত কাজ করেন! রান্নাঘরেই কত কিছু গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের মা-বোনেরা এই কাজগুলো মানুষকে দেখানোর জন্য করেন। যেন কেউ নোংরা না বলে, কেউ সমালোচনা না করে। এই নিয়ত করলে কোনো সওয়াব নেই। (কোব্বাদী, ২০২৫)

পাশ্চাত্য নারীবাদে নারী স্বাধীনতা নামে ধোঁকা

আজকের দুনিয়ায় ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো শুরু করেছে এক নতুন খেলা। তাদের অভিযোগ-ইসলাম নাকি নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছে! এই বলে তারা মুসলিম নারীদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, উসকে দেয় বিদ্রোহের আগুন। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের অনেক বোনই এসব প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ভাবতে শুরু করে, আমাদের কি সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? কিন্তু তারা বুঝে না-এই কথাগুলোর পেছনে কী ভয়ংকর ফাঁদ লুকিয়ে আছে। বাস্তবতা হলো, ইসলাম নারীর ওপর কোনো জুলুম করেনি, বরং তাকে সম্মান আর নিরাপত্তার চাদর পরিয়ে দিয়েছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান-সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে কেবল ইসলামই। আর যারা নারীর নামে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তারা আসলে নারীকে উপভোগ্য বস্তু বানাতে চায়। তারা হিজাবের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু নারীর শরীরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য বানাতে দ্বিধা করে না। তারা ইসলামকে দোষ দেয় নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার, কিন্তু নিজেরাই নারীর দেহের সৌন্দর্যকে বিক্রি করে বাজারে। তারা পর্দাকে বলে ‘পিছিয়ে পড়া’, আর অশ্লীলতাকে বলে ‘প্রগতিশীলতা’। তাদের কথায় মধুর আবরণ, কিন্তু ভেতরে লুকানো বিষ। তাদের ডাকে আছে মুক্তির সুর, কিন্তু গন্তব্য-চূড়ান্ত গোলামী।

ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এসব প্রোপাগান্ডা চালায়, তারা প্রথমেই বলে-ইসলাম নাকি নারীদের পর্দার ভেতরে বন্দি করে রেখেছে। আর তার বিপরীতে তারা দেখায়-অমুসলিম সমাজে নারীরা অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করে! অথচ বিষয়টা আসলে খুবই সহজ। পর্দা মানে বন্দি নয়; বরং নিরাপত্তা। পর্দা মানে মর্যাদা রক্ষা, নিজেকে সম্মানের ঢালে ঘেরা। নারী যখন পর্দায় থাকে, সে নিজেও নিরাপদ থাকে। তাকে কেউ ভোগের দৃষ্টিতে দেখে না, ব্যবহার করতে চায় না। পুরুষ সমাজও তখন সংযত থাকে-চোখ, মন ও প্রবৃত্তি থাকে নিয়ন্ত্রণে।

একবার পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই- যেখানে নারীদের ‘স্বাধীনতা’ র নামে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে নামানো হয়েছে পণ্যের মতো। পর্দাহীনতার এই পথ তাদের কোথায় নিয়ে গেছে? বিবাহের প্রতি ঘৃণা, পরিবার ভাঙনের মহামারী, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, লিভ-ইন সম্পর্ক, আত্মহত্যা আর বিষণ্ণতার ঢেউ-এটাই সেই স্বাধীনতার পরিণতি, যা তারা দিয়েছে পর্দাহীনতার নামে। সুইডেন-ইউরোপের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোর একটি। বৃটেনের ঠিক পাশেই এর অবস্থান। এই দেশটি এতটাই স্বনির্ভর যে, সেখানে বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়-লাভ কিভাবে বাড়বে, ব্যয় কোথায় কমবে। আমাদের মতো নয়-যেখানে মানুষ ভাবে, টাকা আসবে কোথা থেকে? ওরা ভাবে, এই বাড়তি টাকা খরচ করবো কোন খাতে? তাদের ধনসম্পদ এত বেশি যে, সমগ্র জাতি যদি ছয় বছর কিছু না করে-শুধু খায়, ঘুরে বেড়ায়, আনন্দ করে-তবুও কোনো

টানাপোড়েন হবে না। বেকার হলে সরকার নিজেই মাসিক ভাতা দেয়। বাসা না থাকলে সরকার ঘর বানিয়ে দেয়। অসুস্থ হলে সরকার লাখ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করে। অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা—সব কিছু নিশ্চিত।

বাকি থাকল শুধু জৈবিক চাহিদা। সেখানে তারা আরও স্বাধীন! দেশটি পরিচিত সেক্স-ফ্রি কান্ট্রি হিসেবে। যখন-যার সঙ্গে-যেভাবে ইচ্ছা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে— না আছে লজ্জা, না আছে বাধা। তাহলে তাদের কোনো চিন্তা থাকার কথা নয়, তাই না? কিন্তু বাস্তবতা বড়ই ভয়াবহ। এই ‘স্বাধীন’ সমাজের চেহারায় ফুটে ওঠে দুটি গভীর বিপর্যয়—

১. সুইডেনে শতকরা সত্তরেরও বেশি দাম্পত্য জীবন ভেঙে যায়। ১০০ পরিবারের মধ্যে ৭০টির বেশি পরিবার তালাকের শিকার। বাচ্চারা বড় হয় টুকরো ভালোবাসার ভেতরে— সম্পূর্ণ পরিবারের ছায়া পায় না।

২. সুইডেন পৃথিবীর আত্মহত্যা শীর্ষস্থানে থাকা দেশগুলোর একটি। অভাব নেই, সুযোগের কমতি নেই— তবুও তারা বেঁচে থেকেও জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না।

ইসলাম আমাদের যে একটি বড় নেয়ামত দিয়েছে, তা হলো—পর্দা ব্যবস্থার নির্দেশনা। যার সুফল আমরা নিজেরাই প্রতিদিন ভোগ করছি, অথচ অনেকেই তা বুঝে উঠতে পারি না।

আমাদের দেশে খাদ্যসংকট আছে, বাসস্থানের সংকটও আছে, তবুও শতকরা প্রায় ৯৯% শতাংশ পরিবার এখনো টিকে আছে! ২০২৩ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে তালাকের হার মাত্র ১.১% মাত্র।

প্রশ্ন আসে, এমন শান্তির জীবন আমরা কোথা থেকে পেলাম? এই পরিবার-ভিত্তিক সমাজ কাঠামো কিভাবে রক্ষা পেল?

উত্তর একটাই— আমাদের সমাজে এখনো কিছুটা হলেও ইসলামের পর্দা, শালীনতা, সম্পর্কের পবিত্রতা টিকে আছে। নারী এখনো অনাকাঙ্ক্ষা নিজেই সম্মানিত মনে করে, পুরুষ এখনো অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ববান। সন্তানরা এখনো মা-বাবার ছায়ায় বড় হয়, একটি পূর্ণ পরিবারে হাসি-আনন্দে বেড়ে ওঠে।

এটাই সেই কল্যাণ, যা ইসলামের বিধান মেনে চলার মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি।

নারী-স্বাধীনতার নামে ধোঁকা

একবার তাবলিগ জামাতের একটি দল স্কটল্যান্ডের এডিনবারা শহরে গিয়েছিল। সন্ধ্যার মাগরিবের নামাজ শেষ হয়েছে। মসজিদের দোয়া-দরুদ শেষ করে সবাই যে যার মতো বের হচ্ছিল। এমন সময় এক বিদেশিনী তরুণী এগিয়ে এসে জামাতের এক যুবক-সাথীর কাছে জানতে চাইল, ‘ডু ইউ স্পিক ইংলিশ?’

যুবক বিনয়ের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, বলতে পারি।
 মেয়েটি প্রশ্ন করল, তোমরা এখানে কী করছো?
 যুবক বলল, আমরা আল্লাহর ইবাদত করেছি।
 মেয়েটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আজ তো সানডে (রবিবার) নয়! আবার কিসের ইবাদত?
 যুবক বললো, আমরা সপ্তাহের কোনো একদিন নয়— প্রতিদিন, দিনে পাঁচবার আমাদের রবের ডাকে সাড়া দিই। জীবনের সব কিছু তাঁরই দান। তাই পাঁচবার দেখা করি।
 এ কথা শুনে মেয়েটি কিছুক্ষণ নীরব। তারপর এগিয়ে এসে হাত বাড়াল হ্যান্ডশেকের জন্য।
 যুবকটি মাথা নীচু করে নম্রভাবে বললো, দুঃখিত, আমি আপনার সঙ্গে হাত মেলাতে পারব না।
 মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, কেন?
 জবাবে সে বললো, এই হাত আমি আমার স্ত্রী ছাড়া আর কাউকে স্পর্শ করি না। এই হাত আমার স্ত্রীর আমানত। অন্য কোনো নারীর সঙ্গে এ স্পর্শ হতে পারে না।
 মেয়েটি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। মাটিতে বসে হুঁ হুঁ করে বিলাপ করতে লাগল। বলতে লাগল, তোমার স্ত্রী কতটা সৌভাগ্যবতী! ইশা! আমাদের ইউরোপের পুরুষরা যদি এমন হতো!
 এটা ছিল শুধু একজন তরুণীর কান্না নয়; বরং পুরো পাশ্চাত্যের নারীদের অশ্রু, যারা স্বাধীনতার নামে ধোঁকা খেয়ে ভালোবাসা আর নিরাপত্তাহীনতায় ক্লান্ত।

ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়—এই কেমন স্বাধীনতা?

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী কত সুন্দর করে বলেন, এই যুগে একটা ভয়ানক ভুল চিন্তা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়, নারী যদি ঘরে থেকে স্বামী-সন্তান, মা-বাবা আর ভাই-বোনের জন্য রান্না-বান্না করে, ঘর গুছিয়ে রাখে, তাহলে এটা নাকি অপমান আর বন্দিত্ব!
 কিন্তু সে নারী যদি পরপুরুষের খাবার রান্না করে, হোটেল বা উড়োজাহাজে তাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকে, দোকানে মিষ্টি হাসি দিয়ে গ্রাহককে আকৃষ্ট করে, অফিস-আদালতে বসদের মনোরঞ্জে লিপ্ত হয়, তাহলে সেটাই হয়ে যায় ‘মর্যাদা’ ও ‘স্বাধীনতা’!
 আরো বিস্ময়ের বিষয় হলো, এই তথাকথিত আধুনিক নারী বাইরে আট ঘণ্টা চাকরি করে আর ঘরে ফিরে আগের মতোই রান্না, ধোয়া-মোছার দায়িত্ব পালন করে। এই কি স্বাধীনতা? নাকি দ্বিগুণ পরিশ্রমের বন্দিত্ব?
 ইউরোপ-আমেরিকার বহু নারী আজ এই দমবন্ধকরা চক্রে পিষ্ট হচ্ছে।

অর্ধেক জনশক্তি—এই যুক্তির প্রতারণা

তিনি আরো বলেন, আরেকটি যুক্তি বারবার শোনা যায়, জাতীয় উন্নতির যুগে নারীদের ঘরে বসিয়ে রাখা চলে না। আমরা কি দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে কর্মহীন রাখব?

এই কথা এমনভাবে বলা হয়, যেন দেশের সকল পুরুষের কর্মসংস্থান ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে! যেন চাকরির বাজারে আর কোনো প্রতিযোগিতা নেই!

কিন্তু বাস্তবতা হলো, যেখানে একটি ক্লিনার কিংবা পিয়নের পদ খালি হলে দশ-দশটি মাস্টার্সধারী যুবক দরখাস্ত জমা দেয়, সেখানে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়া কতটা যৌক্তিক?

প্রথমে তো পুরুষদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব পালন করুন, তারপর না হয় ‘অবশিষ্ট অর্ধেক’ জনশক্তির কথা ভাববেন।

জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অধিকারে ইসলামের সৌন্দর্য

১। ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে তার স্বাধিকার প্রদান করতে উদ্বুদ্ধ করে। শুধু মানুষই নয়, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের অধিকার সম্বন্ধেও উদাসীন নয় ইসলাম। অধিকারীর অধিকার লংঘন করতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَغْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .البقرة والمائدة

অর্থাৎ, বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (বাক্বারাহঃ ১৯০, মায়িদাহঃ৮৭)

পশুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনে পুরস্কার রেখেছে ইসলাম।

রসূল (সঃ) বলেন, “এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।”

লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে?’ তিনি বললেন, “প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।” (বুখারী ২৪৬৬ নং, মুসলিম ২২৪৪ নং)

পশুর অধিকার নষ্ট করার এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর হওয়ার সাজা রেখেছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

عَذَبَتْ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

“এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

একদা মহানবী (সাঃ) একটি উটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, “তোমরা এই অবলা জন্তুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তা খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।” (আবু দাউদ, ইবনেখুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২২৭৩নং)

অহেতুক গাছ কেটে ফেলতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি (খামোখা) কোন কুল গাছ কেটে ফেলবে (যে গাছের নিচে মুসাফির বা পশু-পক্ষী ছায়া গ্রহণ

করত), সে বাক্তির মাথাকে আল্লাহ সোজা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” (আবু দাউদ ৫২৩৯নং)

প্রিয় নবী এ আরো বলেন, “যে কোন মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জয় ভক্ষন করে, তবে তা তার জন্য সদকাহ (করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ) হয়।” (বুখারী ২৩২০নং) (মাদানী)

সামাজিকতা ও সহাবস্থানে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। সামাজিকতা ও সহাবস্থানের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। আমীর-গরীব, উঁচু-নিচু সকলেই একপাত্রে পানাহার করতে পারে। এক জায়গায় বসতে পারে। এমনকি মসজিদেও আমীর-গরীব সবাই সমান। সেখানে কেবল ধনীদের দাপট থাকবে---তানয়।

বসার জায়গা, যা যার, তা তার। গরীবকে তুলে কোন ধনী সেখানে বসতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন অবশ্যই না বসে। বরং তোমরা জায়গা প্রশস্ত ক'রে ও নড়ে-সরে জায়গা ক'রে বসো।” (বুখারী ও মুসলিম)

যে জায়গায় যে বসেছিল, কোন কাজে সে অন্যত্র গিয়ে ফিরে এলে, সেই জায়গার বেশি হকদার সেই। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “মজলিস থেকে কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সেই ঐ জায়গার বেশি হকদার।” (মুসলিম)

সেখানে আমীর-গরীব দেখা হয় না। গরীব হলেও সে তার নিজ জায়গা গ্রহণ করবে অনায়াসে। ধনী বা প্রভাবশালী বলেই কেউ অন্যদের মাঝে ফারাক সৃষ্টি তাদের মাঝে বসতে পারে না। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে তফাৎ সৃষ্টি করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী) আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, “দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে বসা যাবে না।”

উঠা-বসার আদব শিখাতেও কুরআন বলে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত কর', তখন তোমরা প্রশস্ত ক'রে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ততা দেবেন। আর যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তখন তোমরা উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (মুজাদালাহঃ ১১)

২। তিনজন একত্রে থাকলে একজনকে ছেড়ে দুইজন গোপনে বা ফিসফিসিয়ে কিছু বলাকে পছন্দ করে না ইসলাম। যেহেতু তাতে তৃতীয়জনের মনে কুধারণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে আপোসের মাঝে বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন (কোন স্থানে) একত্রে তিনজন থাকবে, তৃতীয়জনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে।” (বুখারী ও মুসলিম)

৩। ইসলাম সহাবস্থানে ও লোকাচরণের আদব শিক্ষা দিয়ে মুসলিমকে পথে-ঘাটে বসতে মানা করে।

মহানবী (সাঃ) বলেন, "তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি।' রাসূলুল্লাহ বললেন, "যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার হক আদায় কর।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কী?' তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।" (বুখারী-মুসলিম) (মাদানী)

ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য

১। ইসলাম মুসলিমকে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয়ভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতে আদেশ করে। শির্ক, কুফরী, মুনাফিকী ও অমূলক বিশ্বাসের অপবিত্রতা থেকে মনকে এবং প্রস্রাব-পায়খানা, ঋতুস্রাব ও বীর্য ইত্যাদি থেকে দেহকে পবিত্র রাখতে নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থীগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। (বাক্বারাহঃ ২২২)

যাতে অহংকার সৃষ্টি হয়, এমন বিলাসিতাকে অপছন্দ করে ইসলাম। তবে সৌন্দর্য বর্জন করতে আদেশ করে না। ভালো খেতে ও পরতে নিষেধ করে না। এ ব্যাপারে বিধান হল,
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي (۳۱)
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। বল, 'আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।' এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি। (আ'রাফঃ ৩১-৩২)

মহানবী (সাঃ) বলেন, “তোমরা যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যেমন ইচ্ছা তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দু'টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও অহংকার।” (বুখারী, মিশকাত ৪৩৮০নং)

২। মানুষের জ্ঞান-বিবেক নষ্ট ও ধ্বংস করে দেয়, এমন সকল মাদকদ্রব্যকে 'হারাম' ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (মায়িদাহঃ ৯০)

৩। ইসলাম আত্মহত্যাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। যেহেতু আত্ম মানুষের মালিকানাভুক্ত নয়। সৃষ্টিকর্তার দেওয়া প্রাণকে হত্যা করার অধিকার মানুষকে দেয়নি ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করো না। (বাক্বারাহঃ ১৯৫)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

অর্থাৎ, তোমরা আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (নিসাঃ ২৯)

৪। ইসলাম মানুষকে সম্মান দিয়েছে। এমনকি মরণের পরেও তার যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেছে। যথানিয়মে গোসল দিয়ে সুগন্ধময় কাফনে জড়িয়ে তার জন্য শুভ কামনা ও কল্যাণ প্রার্থনা করে সসম্মানে তার শেষ ঠিকানায় রেখে আসার নির্দেশ দিয়েছে। লাশের প্রতি অসম্মান করতে ও তার হাড়িড ভাঙতে নিষেধ করেছে। মৃতকে গালি দিতে নিষেধ করেছে। কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছে। জুতো পায়ে কবরস্থানে চলতে বারণ করেছে। মৃতের সন্তানকে তার জন্য দুআ ও দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিয়েছে।

অবশ্য মৃতের সম্মানে বাড়াবাড়ি করতেও নিষেধ করেছে, যাতে পৌত্তলিকতার পরশ না লেগে বসে। লা বাহুল্য, ফুল চড়ানো, চাদর চড়ানো, ধূপবাতি বা মোমবাতি জ্বালানো, তার সামনে প্রণতি জানানো ইত্যাদিতে ইসলামের অনুমোদন নেই। (মাদানী)

ধন-সম্পদ বিষয়ে ইসলামের সৌন্দর্য্য

১। ইসলাম পরের ধন অবৈধ কোন উপায়ে গ্রহণ করতে নিষেধ করে। অসদুপায়ে উপার্জন করতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (নিসাঃ ২৯)

২। ইসলাম পার্থিব কোন স্বার্থে ঋণ দিতে নিষেধ করে, সুদ খেতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থাৎ, যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক'রে দিয়েছে। তা এ জন্য যে তারা বলে, 'ব্যবসা তো সুদের মতই।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে (সুদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে, তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় (সুদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই দোষখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (বাক্বারাহঃ ২৭৫)

ইসলাম যেমন সুদ খেতে নিষেধ করে, তেমনি দিতেও নিষেধ করে এবং তার কোন প্রকার সহযোগিতা করাকেও হারাম ঘোষণা করে।

আল্লাহর রসূল (সাঃ) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষাদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, “(পাপে) ওরা সকলেই সমান।” (মুসলিম ১৫৯৮নং)

“সুদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো!” (ইবনে মাজাহ ২২৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮-৪৪নং)

৩। ইসলাম ঘুস দেওয়া-নেওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুস দিও না। (বাক্বারাহঃ ১৮৮)

৪। ইসলাম অপরের মালকে চুরি করে নিতে হারাম ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে তাকীদ করার জন্য চোরের হাত কেটে নিয়ে শাস্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ, চোর এবং চোরনীর হাত কেটে ফেলো, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর तरফ হতে শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (মায়িদাহঃ ৩৮)

৫। এমনকি কুড়িয়ে পাওয়া মালেও কোন মুসলিমের অধিকার নেই। আল্লাহর নবী (সাঃ)-কে হারিয়ে যাওয়া উটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে হলে তিনি বললেন, “তোমার সাথে তার সার্থ কী? তার সঙ্গে তার পানীয় থাকে, জুতা থাকে। পানির জায়গায় এসে পানি খেয়ে এবং গাছপালা ভক্ষণ (করে বেঁচে থাকতে) পারে। পরিশেষে (খুঁজতে খুঁজতে) তার মালিক এসে তাকে পেয়ে যায়।” (বুখারী, মুসলিম)

৬। দেওয়ার সময় ওজনে বা মাপে কম এবং নেওয়ার সময় ওজনে বা মাপে বেশি নিতে বা দাঁড়ি মেরে লোককে ধোঁকা দিতে নিষেধ করেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থাৎ, মেপে দেয়ার সময় পূর্ণরূপে মাপো এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতম। (বানী ইস্রাঈল: ৩৫)

৭। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে আদেশ করে ইসলাম। পরিশোধে টাল-বাহানা করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ইসলামে। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি লোকের মাল (ঋণ) নিয়ে তা আদায় করার সংকল্প রাখে, সে ব্যক্তির तरফ থেকে আল্লাহ তা আদায় করে দেন। (অর্থাৎ পরিশোধের উপায় সহজ করে দেন।) আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য রেখে লোকেদের মাল গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন” (বুখারী ২৩৮৭, ইবনে মাজাহ ২৪১১নং)

৮। কেউ কারো সম্পদ নষ্ট করলে তার খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يَمِثْلُ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ, যে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথী। (বাক্বারাহঃ ১৯৪)

৯। ইসলাম মানুষকে উপার্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

অর্থাৎ, তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা ওর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেওয়া রুখী হতে আহাৰ্য গ্রহণ কর। আর পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট। (মুন্ধঃ ১৫)

১০। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে নিষেধ করে। চিৎ হস্তের লোককে অপছন্দ করে।

প্রিয় নবী বলেন, “সর্বদা যাচ্যগ করলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকালে তার চেহারায় কোন মাংসপিণ্ড থাকবে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

১১। উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের দায়ভার বহন করে ইসলাম। তার জন্য মুসলিমদেরকে সাদকাহ বা দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত করেছে। দানের বিনিময়ে বহুগুণ প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য-বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য-দানা। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি ক'রে দেন। আল্লাহ মহাদানশীল, মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহঃ ২৬১)

১২। বরং নির্দিষ্ট পরিমাণ পশুসম্পদ, ফসল, স্বর্ণ-রৌপ্য বা অর্থ থাকলে নির্দিষ্ট শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন মহান সৃষ্টিকর্তা। আর তা হল ইসলামের তৃতীয় রুকন। তা আদায় না করলে মহাশাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিতে দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দাগা হবে, (আর বলা হবে,) ‘এ হচ্ছে তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সন্ধিত জিনিসের স্বাদ গ্রহণ কর।’ (তাওবাহঃ ৩৪-৩৫)

১৩। যা হারাম, তা স্পষ্ট করেছে ইসলাম। যা হালাল তাও স্পষ্ট আছে। কিন্তু কিছু এমন জিনিস আছে, যা অস্পষ্ট ও সন্দিগ্ধ। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান হল,

“হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্ধিগ্ধ বিষয়-বস্তু। যে ব্যক্তি কোন সন্ধিগ্ধ পাপকে বর্জন করবে, সে তো (সন্দেহহীন) স্পষ্ট পাপকে অধিকরূপে বর্জন করবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধিগ্ধ কিছু করার দুঃসাহস করবে, সে ব্যক্তি অদূরেই স্পষ্ট পাপেও আপতিত হয়ে যাবে। পাপ আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি। যে ঐ চারণভূমির ধারে-পাশে চরবে সে অদূরে সম্ভবতঃ তার ভিতরেও চরতে শুরু করে দেবে।” (বুখারী ও মুসলিম) (মাদানী)

আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বে ইসলামের বৈশিষ্ট্য

১। ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা রয়েছে অনেক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কুর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।’ (বানী ইস্রাঈল: ২৩-২৪)

মহানবী বলেছেন, “পিতা-মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।” (তিরমিযী)

২। ইসলাম আত্মীয়-স্বজন, অনাথ-দরিদ্র ও প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহশীল সদ্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মসত্ত্ব দাস্তিককে ভালবাসেন না। (নিসাঃ ৩৬)

হিন্দুধর্ম নিয়ে কিছু কথা

হিন্দুধর্ম ও উপত্তি

হিন্দু কোন ধর্মের নাম নয় এটা ভৌগরিকভাবে পাওয়া একটি নাম। তৎকালীন ভারতের উত্তর পশ্চিম সিমাস্তের দিকে সিন্দু নামে একটি নদ ছিল। নদের পার্শ্ববর্তী এলকা, স্থানের নাম করণ করা হয় সিন্দুস্থান এবং নদের তীরে বসবাসকারীদের নাম করণ হয় সিন্দু। পরবর্তীতে পারসী বনিক ও সৈন্যদল এখানে এসে উপস্থিত হয়। তাদের উচ্চারণগত সমস্যার কারণে স এর স্থানে হ বলতো যার ফলে তারা সিন্দুনদকে হিন্দুনদ, সিন্দুস্থানকে হিন্দুস্থান এবং সিন্দুদেরকে হিন্দু নামে। পরবর্তীতে হিন্দু নামেই তারা পরিচিতি লাভ করে। মূলত হিন্দু কোন ধর্মের নাম নয়, বরং তাদের ধর্মের নাম হচ্ছে সনাতন। সনাতন শব্দের অর্থ- আদি, পুরাতন, চিরন্তন ইত্যাদি। (হিন্দুইজম-পৃ. ৮-৯, জ্ঞান মঞ্জুরী পৃ-২০)

বিভিন্নজন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। ড. উদার কৃষ্ণ বলেছেন-হিন্দু মতবাদ হলো হিন্দুদের ন্যায় জীবনযাপন করার একটি পদ্ধতি। যাতে একদিকে চিন্তা-চেতনার দিকদেয়ে রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, অন্য দিকে রাষ্ট্রের নিয়মিত ক্লসম-রেওয়াজ পূর্ণ করার উপর থাকবে বাধ্য বাধকতা। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, বেদে যা বলা হয়েছে তাই হিন্দুধর্ম। বেদে ধর্মের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ধর্ম হলো যার দ্বারা মানুষের ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জন হয়। সাধারণত যারা দেবদেবী তথা মূর্তির পূজা করে তাদেরকেই আমরা হিন্দু বলে চিনি। (হিন্দুইজম-পৃ. ৮-৯)

কখন থেকে হয়েছে ইতিহাস পাঠে তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় তার রচিত কঙ্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব নামক বইয়ে উল্লেখ করেছেন-হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-২০০০ বছরের মধ্য। আলবেরুনীর ভারত তত্ত্বের মতে ৪৫০০বছর পূর্বে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ৫৬০০ বছর, ৭৩০০ বছর, মতান্তরে ১৮০০০ বছর পূর্বে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। (জ্ঞানমঞ্জুরী ও কঙ্কি অবতার ও মোহাম্মদ সাহেব নামক গ্রন্থদ্বয়ে এর উল্লেখ রয়েছে)

ঈশ্বর বা প্রভু সম্পর্কে বিশ্বাস

হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করে থাকেন যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী পরমেশ্বর (ভগবান) একজনই। তবে তার রয়েছে বহু ক্ষমতা গুন। আর ক্ষমতা গুনকে বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিতে দেব-দেবী রূপে পরমেশ্বরের (ভগবানের) কল্পনা করে পূজা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন ভগবত মহাপুরান অনুযায়ী হিন্দু বিশ্বাস হচ্ছে-পরমেশ্বর যখন সৃষ্টির কল্পনা করলেন। তখন বিশাল পুরুষ রূপ ধারণ করলেন। পরমেশ্বর মহা সমুদ্রের অনন্ত জল রাশির উপর বিশাল ফনা

বিশিষ্ট সর্পের পেঁচানো পালংকে নিদ্রায় শায়িত ছিলেন। তখন নাভী কোমল থেকে এক পড়ের সৃষ্টি হল, এবং সেই কোমল থেকে প্রজাপতিগণের অধিপতি সৃষ্টি হলেন। ভগবানের সেই বিরাট রূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যে 'ই' সমস্ত লোকের কল্পনা করা হয়েছে। পরমেশ্বরের সেই বিরাট রূপ যোগীগণ দিব দৃষ্টি দিয়ে দর্শন করেন। যোগীগণ পরমেশ্বরের সেই বিশাল রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-সেই রূপে রয়েছে অসংখ মাথা, অসংখ মুকুট, অসংখ নাসিকা, চক্ষু, মুখ, হাত, পা, উরু, বস্ত্র এবং অলংকারে পরিপূর্ণ শোভিত থাকায় তা অতি আশ্চর্য জনক, ভগবানের সেই পুরুষ রূপকে নারায়ন বলা হয়। আর নারায়নই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির অক্ষবীজ স্বরূপ-তার থেকে সকল অবতারের প্রকাশ। এই রূপের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা পশু-পক্ষী ও মনুষ্যাদির দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

এই ভগবানের বহু ক্ষমতা গুণের একটি হচ্ছে- সৃষ্টি করা। এমনি ভাবে তার আরও একটি গুণ হচ্ছে প্রতিপালন করা, যার আরও একটি প্রতি মূর্তি হলো যার নাম বিষ্ণু বা পালন কর্তা। বিষ্ণু রূপে তিনি সমস্ত কিছু লালন পালন করেন। ভগবানের মূল তিনটি ক্ষমতা গুণের মাঝে তৃতীয়টি হচ্ছে- বিনাশক বা ধ্বংসকর্তা। এরও একটি প্রতিমূর্তি রয়েছে যার নাম শিব। শিব রূপে তিনি সমস্ত কিছু ধ্বংস করেন এবং ধ্বংসের মাধ্যমে রক্ষাও করেন। পরমেশ্বরের এই ত্রিগুণের তিনটি রূপকে ত্রিমূর্তিও বলা হয়। যাদের নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যিনি শিব নামেও পরিচিত। শুধু যে এ ত্রিমূর্তিই ভগবানের ক্ষমতা গুণ ও অংশ হিসেবে পূজিত তা নয় এদের ছাড়াও রয়েছে অসংখ দেব-দেবী। কথায় আছে হিন্দুধর্মে ৩৩ কোটি দেব-দেবী, বাস্তবে এর সংখ্যা ৩৩ কোটিরও বেশী। "যত্রজীব তত্র শিব। অর্থাৎ সর্বভূতে ঈশ্বর এসত্তে আজ জীবন্ত, অনু-পরমানু সবার মধ্যে" ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিরাজিত একথা বিশ্বাস করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। সুতরাং দেবদেবীর পূর্ব সংখ্যা এখন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অহরহ পাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিম্নে ভগবানের প্রকৃত ত্রিমূর্তি ছাড়াও প্রচলিত প্রধান প্রধান দেবদেবী যাদের পূজার্চনা সর্বদা করা হয় তাদের সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। (হিন্দুর ধর্ম কথা পৃঃ ৩৩)

কেন হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম উত্তম?

সমগ্র মানবজাতির জন্য যে বিধান সেটা হতে হবে সরল ও সহজলভ্য। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় তারা বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা এক এবং তিনি সর্বশক্তিমান সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বশ্রোতা। কিন্তু তার আরো দিক রয়েছে। যেমন আমি যখন এইচ. এস. সি. প্রথম বর্ষে ছিলাম তখন আমার এক সহপাঠীকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এতো মূর্তির পূজা করো কেন? সে বলল আসলে ভগবান তো একজনই কিন্তু উনার কাছে তো সরাসরি চাওয়া যায়

না তাই অন্যান্য দেব-দেবী ও আছে, তাদের কাছে চাইলে তারা সরাসরি ভগবানের কাছে পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে বিপুল সংখ্যক দেবদেবী ও ঈশ্বরের ধারণা পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর ও প্রকৃতির পূজা করছে। এইসব কিছুই ভীষন গোলমালে। যে কোন ব্যক্তি কিভাবে বুঝবে যে কোন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং কোন ঈশ্বরকে মেনে চলা উচিত এবং কোন ঈশ্বর আপনাকে সহায়তা করবে? এসব কিছুই খুবই বিভ্রান্তিকর। যে ধর্ম সমগ্র মানবজাতির জন্য হবে সেটায় এই ধরনের বিভ্রান্তি মানায় না।

হিন্দু নামে কোন কিছুই নির্দিষ্ট নয়। কেউ বিশ্বাস করে ঈশ্বর একজন কেউ আবার বিশ্বাস করে ছয় বারো হাজারো ঈশ্বরের। এই ধর্মে সুনির্দিষ্টতার অভাব রয়েছে।

হিন্দুত্ববাদে কোন কিছুই নির্দিষ্ট নয়। কেউ বিশ্বাস করে কোন ঈশ্বর নেই আবার কেউ বিশ্বাস করে ঈশ্বর একজন, কেউ আবার বিশ্বাস করে ছয় বারো হাজারো ঈশ্বরের। এই ধর্মে সুনির্দিষ্টতার অভাব রয়েছে।

মৌলিক ভিত্তির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এক ঈশ্বর অর্থাৎ এক আল্লাহ, শেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এক কোরআন যা অপরিবর্তন রয়েছে। যেটা খুব সহজ ভাবে বুঝা যায়। আবার হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। বেদের পর আরো রয়েছে উপনিষদ এবং তারপর পুরাণ এবং অনেক অনেক গ্রন্থ। সেগুলোতে রয়েছে নানান ঈশ্বরের পক্ষে নানান ধরনের মত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রব তার ওয়াহদানিয়াতে ভীষণ সরল এবং তার একত্ববাদেও।

তারপরও হিন্দুরা বলে সবশেষে ঈশ্বর এক। যদি এক হয় তাহলে কেন এত রূপ? কেন তারা এতজনের পূজা করছেন? এবং ব্রহ্মার কেন তিনটি মাথা, বিষ্ণুর কেন চারটি হাত কেন সে নীল কেন সে হাতে চাকতি ঘুরাচ্ছে? এমন অনেক কিছুই রয়েছে যেগুলো এমনকি একটা বাচ্চাকে দেখালেও সে এসব দেখে বিভ্রান্ত হবে এটাই ফিতরাত। এইসব খুবই অযৌক্তিক। তখন তারা বলে এটাই বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুক্তি যে মানা হয় না। কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি পর্যায় পর্যন্ত যুক্তি আর কারণ থাকতে হয়। না হয় যে কেউ যেকোনো কিছু বিশ্বাস করবে এবং সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। যে কেউ এসে বলবে, “আমি বিশ্বাস করি, আমি যে কাউকে ঘুষি মেরে বসতে পারি”। মূর্তি পূজার কথা যখন আসে, তখন তারা বলে এটা ঠিক তেমন, যেমন তোমরা কাবার উপাসনা করো। মুসলিমরা কাবার উপাসনা করে না। মুসলিমরা কাবায় আল্লাহর ইবাদত করে এবং কাবার ইতিহাসে জানা যায় কাবার একটি অংশ ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু যখন এর পুনর্নির্মাণ চলছিল তখনও কিন্তু মুসলিমদের ইবাদত থেমে থাকেনি। মুসলিমরা কাবার ভেতরে যেতে পারে। কিন্তু মূর্তিগুলোর ক্ষেত্রে কি তারা মূর্তির ভেতরে যেতে পারে! অবশ্যই না। ব্যাপারগুলো একদমই

এক নয়। কাবার ভেতরে যদি দেখা হয় শুধুই পাথর খুঁজে পাবে। মুসলমানদের কাছে এর কোন নির্দিষ্ট আকার বা অন্য কিছু নেই। যদি তারা এর উপাসনা করতো তাহলে এর বিশেষ আকৃতি থাকতো। এই কারণেই তারা কোন ছবি রাখে না।

ইসলামের কথা বললে বলা যায়, প্রত্যেকটা যুগই আলাদা ছিল। ঈসা আলাইহিস সালামের যুগ ছিল চিকিৎসাবিদ্যার যুগ, মুসা আলাইহিস সালামের যুগ ছিল জাদুবিদ্যার যুগ, এখন চলছে বিজ্ঞানের যুগ। এখন মানুষ বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণেই যখন কোন কিছু ঈশ্বরের পক্ষ থেকে আসে তখন তাকে যে মাপকাঠিতেই মাপা হোক না কেন এর নিজের একটি স্বতন্ত্র মহত্ত্ব থাকা উচিত। কোরআনের ক্ষেত্রে একই কথা খাটে। কারণ এটি শাস্ত্রত। এর বিজ্ঞান ভিত্তিক আয়াতগুলো ১৪০০ বছর আগে যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল এমনকি এখনো যে কেউ সেই বিজ্ঞান ভিত্তিক আয়াতগুলো চর্চা করলে তা বিজ্ঞানের চোখে আজও প্রাসঙ্গিক। যদিও বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল। কোরআনের আয়াতগুলো কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর দেয় না তাই কোন প্রশ্নের উত্তর পেতে আজকালকার জেনারেশন বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়। তারা যুক্তি এবং বিবেকের আশ্রয় নেয় আর এই ব্যাপারগুলোতেই হিন্দুত্ববাদ হেরে যায়। কারণ এতে হাজারো পরিবর্তন এসেছে আর লেখাগুলো কখনো সংরক্ষণ করা হয়নি। লেখাগুলো যে একই আছে তার কোন প্রমাণ নেই এমনকি শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই বেদ পড়তে পারে। তারা উচ্চবর্ণের লোকজন। নিচু বর্ণের লোকেরা সে গ্রন্থ পড়তেও পায় না। এর কি কোন মানে আছে যে ঈশ্বর একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যার কোন আদি অন্ত নেই! আর তার উপর সকলের সেটা পড়ারও অধিকার নাই। অবশ্যই সবার অধিকার থাকা উচিত। প্রত্যেকের সেই বইয়ের উপর অধিকার থাকা উচিত এমনকি আজও বেদের তুলনায় লোকে ভগবত গীতা, মহাভারত বা রামায়ণের সাথে অনেক বেশি পরিচিত। বেদে সত্যিকার অর্থে মূর্তি পূজা বা অন্যান্য পূজার কথা বলা হয়নি। তাই হিন্দুরা যদি সত্যিকার অর্থে মিল খুঁজে পেতে চায় তাহলে বেদ পড়তে পারে। তাদের বিশ্বাসমতে সেটাই একমাত্র ঐশ্বরিক গ্রন্থ। বেদ পড়লে তারা দেখতে পাবে সেখানে মূর্তি পূজার কোন কথা এবং বহু ঈশ্বরও নেই। এরপর ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরকে ঢোকানো হয়েছে তাই অবশ্যই এটা আরোপিত লোকের ইচ্ছামত যোগ করা হয়েছে।

য এতং দেবমেকবৃতং বেদ।।

ন দ্বিতীয় ন তৃতীয়চতুর্থো নাপ'চ'তে।

ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপু'চ'তে।

নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপু'চ'তে।।

অর্থ- যিনি তাহাকে শুধুই এক বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাকে প্রাপ্ত হন। প্রভু এক, তিনি ছাড়া কেউ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয় না। (অথর্ব বেদ ১৩ কান্ড ৮ অনুবাক ২ সূক্ত ২-৫ মন্ত্র)

হিন্দু গ্রন্থের সাথে কোরআনের পার্থক্যের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় শুধু সংরক্ষণের ক্ষেত্রেই কুরআন মূলত তিনভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রথমত একটি জীবন্ত ভাষার সাহায্যে। আরবি হলো পৃথিবীতে সর্বাধিক ব্যবহৃত পাঁচটি ভাষার একটি। বেদের ভাষা সংস্কৃত সেটা কিন্তু জীবন্ত ভাষা নয়। তার উপর আপনি যদি মুখস্ত রাখার কথা বলেন এটাও কিন্তু কোরআন সংরক্ষণের একটি উপায়। ছয় বছর বয়সী শিশুরা কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্ত করতে পারে কিন্তু কেউই দাবি করেনি যে তারা বেদ অথবা উপনিষদ কিংবা মহাভারত কিংবা ভগবত গীতা মুখস্থ করেছে। তৃতীয়ত কোরআনের সবচেয়ে পুরাতন পান্ডুলিপি রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহামে। ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড এর কার্বন ডেটিং করেছে। কুরআন সংকলনের সময়ের সাথে যার মিল পাওয়া গেছে। কিন্তু এই কথাটি তারা তাদের ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে বলতে পারবে না। তারা বলে না এটা মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে। কিন্তু যখন মুখে মুখে কোন কিছু প্রচলিত হয় সেটা চাইনিজ ছইসপারের মতোই। এতে নানা ব্যাখ্যা যোগ হয়। অনেক সংযুক্তি ঢুকে পড়ে। এতে বর্ণনার কোন ধারাবাহিকতা থাকে না যা মুসলিমদের আছে। তাদের হাদিস বর্ণনার ও একটি সুস্পষ্ট ধারা রয়েছে।

বহু ঈশ্বরের চাইতে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস বেশি যৌক্তিক। কোরআনে খুব সহজ একটি যুক্তি দেওয়া আছে। যদি একাধিক ঈশ্বর থাকতো তাহলে তাদের ইচ্ছেগুলোর মধ্যে জট লাগবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটা গাছ একজন দেবতা চাইলো এটা লাল হোক অন্য আরেকজন চাইলো এটা সবুজ হবে আরেকজন চাইবে সেটা নীল হবে। সেই গাছটা তাহলে কি রঙের হবে! এই প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছে নেই। তাদের তিনজনেরই ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। যদি এদের একজনের মত গ্রহণ করা হয়, এর মানে হলো ঈশ্বর হিসেবে বাকি দুইজন অপেক্ষাকৃত দুর্বল! তাই বলা যায়, বহু ঈশ্বরবাদের কোন মানেই দাঁড়ায় না। প্রকৃত, অদ্বিতীয় সত্তা কেবল একজনই থাকতে পারেন।

প্র্যাগ্টিক্যাল লাইফের প্রসঙ্গ যখন আসে তখন কেবল ইসলামী একমাত্র সমাধান। এই ধর্ম প্রত্যেকটা জিনিসের সূক্ষ্ম বর্ণনা দেয়। কিভাবে টয়লেটে যাবে? কিভাবে এবং কতটুকু খাবার খাবে? কেমন আওয়াজ করতে পারবে না, কখনো নিজের বাবা-মাকে উফ বলবেন না। এতটা বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে যা অন্য কোনো ধর্মে নেই। ইসলাম হলো সর্বাঙ্গীন। আপনি যেখানেই যান না কেন ইসলাম আপনাকে সবার সেরা হয়ে ওঠার পথ দেখাবে। অথচ যদি হিন্দু ধর্মের কথা বলি, তাদের দেবতারা তাদের যেকোনো গল্পতেই বছরের পর বছর তাদের ধ্যানে কাটাতে হয়। খুব কষ্টকর অবস্থায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এবং শিবের কাছে বছরের পর বছর ধরে প্রার্থনা করেছে বা ব্রহ্মার কাছে। এটাই কি ইবাদত! এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা। ইবাদত তো এমন হওয়া উচিত যা সবাই করতে পারে। যেমন কেউ বৃদ্ধ হোক বা

তরুণ সালাত আদায় করতে পারে। দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে। এটা সবার জন্যই সহজ।
পরিশেষে বলা যায় ইসলাম একটি সুন্দর, সহজ, শান্তি প্রিয় এবং সার্বজনীন ধর্ম।

খৃস্টধর্ম নিয়ে কিছু কথা

খৃস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস ৫টি।

১. ত্রিত্ববাদ।

২. অবতারত্ববাদ।

৩. শূলবিদ্ধ হওয়া বিশ্বাস।

৪. পুনর্জীবিত হওয়ার বিশ্বাস।

৫. পাপমোচন বা প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস।

ত্রিত্ববাদ

আল্লাহ তায়ালায় অস্তিত্ব এবং তার গুণাবলী সম্পর্কে খৃস্টানদের ধারণা অন্যান্যদের মতোই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত ধারণার ব্যাখ্যা তারা ভিন্নভাবে দিয়ে থাকে। তারা বলেন, আল্লাহ তিন সত্তার সমষ্টি। (Trinity) বা ত্রিত্ববাদ-এর সাধারণ অর্থ 'তিনত্ব', তিনের সমাহার বা তিনের সমষ্টি। খৃস্টধর্মের পরিভাষায় এর অর্থ (the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead): পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিনজন ব্যক্তি হিসেবে এক ঈশ্বরত্বের মধ্যে একত্রিত হওয়া। তিন সত্তা নির্ধারণে খ্রিস্টানদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। প্রসিদ্ধ মতে তিন সত্তা হলো- পিতা, পুত্র, রুহুল কুদুস (পাক রুহ)। কেউ বলেন পিতা, পুত্র, কুমারী মেরী।

খৃস্টান পণ্ডিতগণ সকলেই একমত যে, (Trinity) শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোথাও নেই। খৃস্টের কোনো বাক্যে কখনো এ শব্দটি বা এ অর্থের কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি খৃস্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও এ পরিভাষাটি কখনো ব্যবহার করেন নি। মূলত দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এ পরিভাষাটির জন্ম। কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয় তৃতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু কার্থেজের প্রেসবিটার (Presbyter) টার্টোলিন (Tertullian), যিনি ২২০ খৃস্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সর্বপ্রথম এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তখনো এ পরিভাষাটির অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার অর্থে বিগত ২০০০ বৎসরে কখনো এ পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয় নি। খৃস্টধর্মের মধ্যে অগণিত দল, উপদল। ও মতভেদ মূলত এ বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা নিয়ে। প্রথম খৃস্টীয় শতকে অনেক খৃস্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষ ঈশ্বর হতে পারে, বা ঈশ্বর মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন এরূপ বিশ্বাস কখনোই ইহুদীদের মধ্যে ছিল না। তবে পৌত্তলিক রোমানগণের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস অতি-প্রচলিত ছিল। তাঁরা সম্রাটকেও ঈশ্বর

বা ঈশ্বরের প্রতিভু হিসাবে পূজা করতো। এছাড়া গ্রীক দর্শনভিত্তিক রোমান ধর্মে প্রজ্ঞা (Logos)-কে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হতো। মিস্টার পৌল ও প্রথম যুগের কিছু খ্রিস্টান গুরু এ সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথমে 'যীশুর' ঈশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। এরপর এ বিশ্বাসের সাথে 'একত্ববাদে'র সমন্বয় এবং যীশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো এই ত্রিত্ববাদ।

দলীল

১নং দলীল

মথি ২৮নং অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে তোমরা সমুদয় জাতিকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ কর। এখানে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ করা অর্থাৎ এ তিনজনের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাওবা করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে বলা হয়েছে। এখানে কোথাও এ তিনজন মিলে এক ঈশ্বর এরকম কোন বাক্য প্রয়োগ হয়নি। যেভাবে আমরা মুসলিম জাতীরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তায়ালা তার ওহী জিবরীল আমীন আ. এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রেরণ করেছেন। এ বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারবেনা।

২নং দলীল

মথি ৩নং অধ্যায়ের ১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- ঈশ্বরের আত্মা কপুতের আকৃতিতে যীশুর কাছে আসে এবং আকাশের দিক থেকে এই বাণী হইল ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতে আমি প্রীত। এখানে বলা হয়নি সম্বরের অংশ পৃথিবীতে এসে যীশুর রূপ ধারণ করলো। বরং এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে যাও ঈশ্বরের আত্মাকে কপুতের আকৃতিতে তার কাছে আসতে দেখলেন। বাইবেলের এ বক্তব্য দ্বারা কি ত্রিত্ববাদ বা এই তিনে মিলে এক ঈশ্বর প্রমানীত হয়? আমরা জানি সমস্ত আত্মাই আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে আসা, একটি নির্দেশ, সকল আত্মাই তার, তবে অংশ নয়। আত্মার পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন। রুহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (সূরা ইসরা-৮৫)

কেন খৃষ্টধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম উত্তম?

খ্রিষ্ট ধর্মের বিশ্বাস মতে আদম আলাইহিস সালাম ফল খেয়ে পাপ করেছিলেন। এইজন্য আদমের যত সন্তান কেয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করবে সবাই অভিশপ্ত। সবাইকে দোজখে যেতেই হবে। অথচ আল্লাহ বলেন,

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (সূরা বাকারা-৩৭)

তাই স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার নিজের ছেলে ঈসা কে পাঠিয়েছেন মানুষকে এই অভিশাপ থেকে বাচাতে। ঈসা ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর মাধ্যমে সবার পাপ তার রক্ত দিয়ে বহন করে ধুয়ে গেছে। এইটুকু বিশ্বাস করে যত পাপ করো সমস্যা নেই। যীশু খ্রিস্ট বহন করে নিয়ে যাবে।

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআ'লা বলেন,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে। (সূরা আনআম-১৬৪) তাদের এই ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার একটি গল্প বলেছিলেন।

“এক হুজুর আর তার মুরিদ সফরে বেরিয়েছে। সফরে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশ সফর করছে। এক দেশে গিয়ে দেখেন, সে দেশে তেলের যে দাম ঘি এর ও সেই দাম। মুরিদের খুব ঘি খাওয়ার লোভ ছিল। ঘি তে ভাজা পরোটা, ঘিয়ের বিভিন্ন জিনিস খাওয়ার খুব লোভ ছিল। কিন্তু ঘির দাম বেশি হওয়াতে খেতে পারতেন না। এখন তেল আর ঘির দাম এক শুনে সে খুব খুশি।

হুজুরকে বলল, হুজুর! এই দেশ ছাড়া যাবে না। আমি একটু এদেশে থাকবো। কারণ এই দেশে থাকলে আমি ঘিয়ের পরোটা, ঘিয়ের বিভিন্ন জিনিস, মিষ্টি, মন্ডা খাবো। হুজুর বলেন, ‘একদিনও এদেশে থাকা যাবে না। যে দেশে তেল আর ঘির এক দাম। সেই দেশে কিন্তু কোন ইনসাফ থাকে না। পালাতে হবে, বেইনসাফি দেশে থাকা যাবে না।

মুরিদ গেল না হুজুর চলে গেল ওই রাতেই। মুরিদ আরামে ফুর্তিতে যাচ্ছে ঘি আর ঘি। কারণ ঘি সস্তা। তেলের দাম যা, ঘিও তা। তাই তেল খাবো কেন? সব খালি ঘিয়ের জিনিস খাবো। প্রায় বছরখানেক চলে গেছে খুব আরামে শান্তিতে আছে।

হঠাৎ ওই দেশের একটা বাড়িতে এক চোর শীদ কেটে ঢুকেছে। ঢুকে চুরি করে মাল নিয়ে বের হবার সময় ওই মাল বেশি হওয়াতে ধাক্কা লেগে বাড়ির দেওয়ালটা ভেঙ্গে ওই গর্তের ভিতরে পড়ে সে মারা যায়। সকালে খবর হয়েছে যে, একটা মানুষ খুন হয়েছে। রাজা বলেছে, ‘একটা মানুষ খুন হয়েছে। তার বিচার করতে হবে। ধরে নিয়ে আসো বাড়ির মালিক কে’। ধরে নিয়ে আসা হলো বাড়ির মালিককে। রাজা বলল, ‘তোমার বাড়িতে একটা মানুষ খুন হয়েছে। তোমার ফাঁসি হবে।’ সে বলে, ‘আমার কি দোষ! আমি তো আর দেওয়াল বানাইনি। বাড়ি বানাইনি। অমুক রাজমিস্ত্রী আমার বাড়ির দেওয়াল বানাইছিল। দোষ যদি হয়, তার। তাও তো ঠিকই বলেছো। রাজা বলল, “রাজমিস্ত্রীকে ধরে নিয়ে আসো।” রাজমিস্ত্রী বলে, “হুজুর আমার দোষ না। আমার হেল্লার, সে নিশ্চয়ই সিমেন্ট বালি কম বেশি করেছে। তার জন্য দেওয়ালটা ভেঙে গেছে।” হেল্লারকে ধরে আনা হয়েছে। হেল্লার গরীব মানুষ। গরীবের পক্ষে কেউই থাকে না। ও যতই বলছে, ‘আমি ভেজাল টেজাল দেইনি’। তখন লোকজন বলছে, ‘না! ওই শয়তানি করেছে’। তারা বলল, ‘অবশ্যই ওর শয়তানিতেই একটা মানুষ মরেছে, ওর ফাঁসি হবে’।

ফাঁসির রশি টসি আনা হলো। দামি ফাঁসির রশি। হেল্লার ছিলো গড়নে শুকনো। রশি গলায় দিয়ে দেখে, ওর রশি বের হয়ে যায়। রশিটা একটু চওড়া আঁ ওর গলাটা একটু চিকন। তো রাজা বলল, ‘এটা তো ভয়ঙ্কর অবস্থা। কি করা যায়! এইরকম একটা খুন তো বিনা বিচারে হতে পারে না। খুনের শাস্তি হতেই হবে। দেখো তো গলা মোটা দেখে একজনকে ধরে নিয়ে এসো’। গলা মোটা স্বাস্থ্য ভালো এরকম একজনকে ধরে নিয়ে আসা হলো উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের মধ্য থেকে যারা ফাঁসি দেখার জন্য এসেছিল। সেই লোক হলো ঐ মুরিদ। বেশ তেল ঘি খেয়ে মোটা হয়েছে। দেখা গেলো ওর গলার সাথে রশি বেশ মিলে যাচ্ছে। ঝুলিয়ে দিলেই টাইট হয়ে যাবে মরে যাবে। তখন রাজা বলল, ‘তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে’। সে বলে, ‘হুজুর আমার কি দোষ?’ রাজা বলে, “এত বড় খুন হলো। তার বিচার হবে না! আমি এরকম জালেম হতে পারি না। তোমার ফাঁসি দিতেই হবে।” এখন বেচারী, কান্নাকাটি করছে। রাজা ছাড়তে রাজি না। ঠিক ওই সময় ওই গুরু দেশে আসছে। ভাবলো গিয়ে দেখি আমার শিষ্য কেমন আছে ঐ শহরে। দেখে অনেক লোক জমায়েত হয়ে আছে। এসে দেখে তার মুরিদ হাও মাও করছে, আর তাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। গুরুকে দেখে মুরিদ তো পাগলের মত। বলে যে, “হুজুর আমাকে বাঁচান!” হুজুর বলল, “কি হয়েছে?”

- এই যে আমার ফাঁসি হচ্ছে।

- কেন? রাজা মশাই কি হয়েছে?”

রাজা জানালেন, এই এই কারণ। একটা চোর মারা গেছে। এই মানুষটা মারার জন্য একজন লোককে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু আসল যে দোষী তার গলা চিকন। এইজন্য আপনার মুরিদ কে ধরেছি। কারণ একটা হত্যা বিনা বিচারে হতে যেতে পারে না।

গুরু তো জানে যে, এই দেশে ইনসাফ হবে না। গুরু বলেন, “হ্যাঁ! এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। রাজা মশাই আপনার মত একজন রাজা দরকার। একটু আমাকে ধ্যান করতে দেন।” ধ্যান করে পরে বলছে, “রাজা মশাই! আমার মুরিদ কে না, আমাকে একটু ফাঁসিটা দিয়ে দেন। কারণ আমি ধ্যান করে দেখলাম, আপনার এই ফাঁসির রশিতে এই মুহূর্তে যে মারা যাবে। সে বিনা বিচারে জান্নাতে যাবে। আমি এই সুযোগ ছাড়তে রাজি না। রাজা মশাই। আপনি আমার মুরিদ কে না, আমাকে একটু ফাঁসি দিয়ে দেন। রাজা বললেন, “এত বড় কথা! আমার টাকায় কিনা রশি। আর সেই রশিতে তুমি যাবে জান্নাতে! আমি যাব জান্নাতে। এই রাজা এবং এর বিচারটা কেমন লাগলো? খ্রিস্টানদের থিওরিটাও অনেকটা এইরকমই” খ্রিস্টান মিশনারীরা বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুনাহ করতেন (নাউজুবিল্লাহ)। কাজেই তিনি শাফায়াত করতে পারবেন না। গুনাহগার আবার গুনাহগারে শাফায়াত করে কি করে? ঈসা মসিহ শাফায়াত করবে (নাউজুবিল্লাহ)। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহ করতেন তার প্রমাণ হিসেবে কুরআন থেকে বলে, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দিচ্ছে আগে পরে। তাহলে নিশ্চয় গুনাহ করতো। কিন্তু তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা পাপ করেছেন, তা কোরআন বা হাদিস দিয়ে প্রমাণ করতে পারবে না। অথচ খ্রিস্টানদের বাইবেলেই তাদের বানানো ঈসা মসিহের শত শত পাপ উল্লেখ আছে। বাইবেলে আছে ঈসা মসিহ মানুষদেরকে যাতা বলে গালি দিয়েছেন।

যীশু খ্রিস্ট ঈসা মসিহ রাস্তা দিয়ে একবার যাচ্ছেন তখন উনার খুব খিদা লেগেছে। দেখেন যে কয়েকটা ডুমুর গাছ। তো ডুমুর গাছে ডুমুর খুঁজতেছেন। কিন্তু তখন ডুমুর ধরার ঋতু না থাকায় তিনি ডুমুর খুঁজে পায়নি। এতে তিনি খুব কষ্ট পেয়েছে। বদদোয়া দিয়েছে তখন গাছটা পুড়ে মরে গেছে। এখন কথা হলো একটা নিষ্পাপ গাছকে পুড়িয়ে মারা সওয়াবের কাজ না গুনাহর কাজ! ঈসা মসিহ খ্রিস্টানদের বাইবেলের ভাষায় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কাপড় খুলে ফেলেছেন এবং বেশ্যা মেয়েদেরকে চুমু খেতে দিয়েছেন।

খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক রা বলে সব ধর্ম জেলখানা খ্রিস্টান ধর্ম স্বাধীনতা। আপনারা কি জেলখানা চান নাকি স্বাধীনতা চান স্বাধীনতা চান? তাহলে সাধারণভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সব স্কুল স্বাধীনতা আর ক্যাডেজ কলেজ জেলখানা। তখন আমাদের কারো ছেলে ক্যাডেট কলেজে চান্স পেয়েছে এবং আরেক স্কুলেও চান্স পেয়েছে যেখানে ক্লাস করলেও সমস্যা নাই না করলেও সমস্যা নেই পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বলতে গেলে গ্রামের হাই স্কুল। এখন যদি নিজেদেরকে প্রশ্ন করি আমরা আমাদের সন্তানকে কোথায় দিবো? অবশ্যই ক্যাডেট কলেজে

দিব। আবার যদি বলি একটা দেশ স্বাধীন সে দেশে যে যা করবে করে ফেললেই হলো। খুন করলে খুন করবে, চুরি করলে চুরি করবে, কোন বিচার নেই। আরেকটা দেশ পরাধীন অন্যায় করলেই পুলিশ ধরে ফেলে। বিচারে নিয়ে যায়। কোন দেশে আমরা থাকতে চাইবো? স্বাধীন দেশে না পরাধীন দেশে পরাধীন দেশে? ধর্ম কি মানুষের পাপের লাইসেন্স দেওয়ার জন্য না মানুষকে মানবতা শেখানোর জন্য? তারা কি বলে তারা বলে তুমি যীশু খ্রিস্টের বিশ্বাস করো তিনি তোমার পাপ তার রক্ত দিয়ে বহন করে ধুয়ে গেছে।

বাইবেলে খৃস্টানদের ঈমানের উপর পাঁচ পরিক্ষা

মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৬:১৭-১৮ নং অনুচ্ছেদে আছে-যীশু বলেন, যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে, আমার নামে তারা মন্দ আত্মা ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলে ধরবে, যদি তারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায় তবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, আর তারা রোগীর গায়ে হাত দিলে রোগী ভালো হয়ে যাবে।

খৃস্টধর্মের উপর কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের পরিক্ষা

মথি-১৭:২০নং অনুচ্ছেদে আছে-যীশু বলেন, তোমাদের অল্প বিশ্বাসের জন্যই পারলে না। আমি তোমাদেরকে সত্যিই বলছি, যদি একটা শর্ষে দানার মতো বিশ্বাসও তোমাদের থাকে তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, এখান থেকে সরে ওখানে যাও, আর তাতে ওটা সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।

এ ধরনের বিশ্বাস তাদেরকে মুক্তি দেবে না

যাকোবের ২:১৪নং অনুচ্ছেদে আছে কাজের দ্বারা বিশ্বাস দেখাও আমার ভাইয়েরা যদি কেউ বলে আমার বিশ্বাস আছে কিন্তু কাজে তা না দেখায় তবে তাতে কি লাভ? সেই বিশ্বাস কি তাকে মুক্তি পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারবে?

ইসলামকে আঁকড়ে ধরার গল্প

যুগে যুগে মানুষের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা বিরল নয়। কেউ নাস্তিক অবস্থায় থাকে কিন্তু হঠাৎ বুঝতে পারে সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছে। তখন সে খুঁজতে খুঁজতে হয়তো ইসলামের পথ পেয়ে যায়। আবার কেউ কেউ আছে ইসলামকে হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য ইসলামিক বই পড়তে থাকে। কোরআন পড়তে থাকে। তখন সে বুঝতে পারে আসলে তার ধর্মই ভুল ইসলাম ধর্মই সঠিক। ইসলামের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই ভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআ'লা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

অন্যায় অত্যাচারের বিস্তৃতি পরিমন্ডলে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার বুক চিরে আরও একটি জ্যোতিষ্মান বিদ্যুতের চমকে আরব গগণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী পুরুষ উমার বিন খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত ৬ষ্ঠ বর্ষে হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর। নাবী কারীম (ﷺ) উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারাণী ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলতেন:

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ
'হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।'

(আল্লাহ এ প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং উমার মুসলিম হয়ে গেলেন)। এ দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট উমার (রাঃ) অধিক প্রিয় ছিলেন।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর অন্তরে ইসলাম ধীরে ধীরে স্থান লাভ করতে থাকে। ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার সংক্ষেপ তুলে ধরার পূর্বে তাঁর মেজাজ এবং আবেগ ও অনুভূতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা সঙ্গত বলে মনে করি।

উমার (রাঃ) তাঁর উগ্র মেজাজ, রুঢ় প্রকৃতি এবং বীরত্বের জন্য আরব সমাজে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। মুসলিমগণকে বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁর হাতে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের আভাষ যেন প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হতো যে, ভাবাবেগের দু'বিপরীতমুখী শক্তি যেন

তাঁর অন্তর রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। একদিকে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষগণের অনুসৃত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান ও আকীদা এবং বিপদ আপদে তাঁদের ধৈর্য ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। অধিকন্তু কোন কোন সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মতো তাঁর মনে তত্ত্ব-চিন্তার উদ্রেকও হতো। তিনি আপন খেয়ালে চিন্তা করতে থাকতেন নানা বিষয়, নানা কথা। কোন কোন সময় এটাও তাঁর মনে হতো যে, ইসলাম যে পথের সন্ধান দিচ্ছে, যে পথের চলার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে সম্ভবতঃ সেটাই উত্তম ও পবিত্রতম পথ। এ জন্য প্রায়শঃই তিনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতেন, কোন কোন সময় বিচলিত বোধ করতেন, কখনো বা নিরুৎসাহিত বোধ করতেন।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণাদির সমন্বিত সার সংক্ষেপ হচ্ছে এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে আগমন করেন এবং ক্বাবাহ গৃহেরপর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নাবী কারীম (ﷺ) সেই সময় নামাযে লিপ্ত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরাহ ‘আলহাক্বাহ’ তিলাওয়াত করছিলেন। উমার (রাঃ) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শ্রবণ করলেন এবং এর ঝংকার, বাক্য বিন্যাস ও সুর-মাধুর্যে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও হতবাক হয়ে গেলেন।

উমারের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নাবী (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

“যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল (‘আ.)]-এর (বহন করে আনা) বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।’ (আল-হাক্বাহ ৬৯: ৪০-৪১)

উমার (রাঃ) বললেন, ‘আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন একজন মন্ত্রতন্ত্রধারী গনৎকার। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মাদ (ﷺ) তিলাওয়াত করলেনঃ

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ نَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

“এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।” (আল-হাক্বাহ ৬৯: ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতে সূরাহর শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং উমার (রাঃ) তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে উমার (রাঃ) বলেছেন যে, ‘সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে বসল।

প্রকৃতপক্ষে, উমার (রাঃ)-এর অন্তর রাজ্যে এটাই ছিল ইসলামের বীজ বপনের প্রথম সময়। কিন্তু তখনো তাঁর চেতনায় অজ্ঞতাপ্রসূত আবেগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত প্রভাব জগদদল প্রস্তরের মতো তাঁর মন-মস্তিষ্কে এতই প্রভাবিত করে রেখেছিল যে ইসলামের প্রাথমিক অনুভূতির কার্যকারিতা তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। কাজেই, বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা সংস্কারকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্দ মেজাজে তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে নঈম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভী কিংবা বনু যুহরা কিংবা বনু মাখযুমের কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর দ্রু-যুগল কুণ্ঠিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ‘হে উমার! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? তিনি বললেন, ‘মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।’

লোকটি বলল, ‘মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? উমার বললেন, ‘মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ।’

লোকটি বলল, ‘উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।’

এ কথা শুনে উমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঘৃতাভূতি দেয়ার মতো ক্রোধান্বিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নিপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে খাব্বাব বিন আরাভ একটি সহীফার সাহায্যে সূরাহ ত্ব-হা’র অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব (রাঃ) যখন উমার (রাঃ)-এর সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং উমারের বোন ফাতিমাহ সহীফা খানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাব্বাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।’

তাঁর বোন উত্তর করলেন, ‘না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।’

উমার (রাঃ) বললেন, ‘সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?’

ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, ‘আচ্ছা উমার! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?’

এ কথা শোনা মাত্র উমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগ্নী জোর করে ভ্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও ত্রুষ্ক হয়ে উমার (রাঃ) তাঁর বোনের গলদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,

يَا عُمَرُ، إِنَّ كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْرِ دِينِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
“উমার! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

শাহাদতের এ বাণী শ্রবণ করা মাত্র উমার (রাঃ)-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়াদ্র কণ্ঠে বললেন, ‘তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাওনা দেখি। বোন বললেন, ‘তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এটা স্পর্শ করা চলে না। শুধু মাত্র পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। উমার গোসল করে পাক-সাফ হলেন তার পর সহীফা খানা হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। বলতে লাগলেন এ তো বড়ই পবিত্র নাম!

তারপর সূরাহ ত্ব-হা হতে পাঠ করলেন:

طه ١ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى ٢ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ٣ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ٤ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٥ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٦ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ٧ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٨ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٩ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٠ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُذًى ١١ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَى ١٢ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ١٣ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ١٤ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ١٥ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٦

“১. ত্ব-হা-। ২. তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। ৩. বরং তা (নাযিল করেছি) কেবল সতর্কবাণী হিসেবে যে ভয় করে (আল্লাহকে)। ৪. যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট হতে তা নাযিল হয়েছে। ৫. ‘আরশে দয়াময় সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। ৬. যা আকাশে আছে, যা যমীনে আছে, যা এ দু’য়ের মাঝে আছে আর যা ভূগর্ভে আছে সব তাঁরই। ৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল (তাহলে জেনে রেখ) তিনি গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয় জানেন। ৮. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। ৯. মূসার কাহিনী তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? ১০. যখন সে আগুন দেখল (মাদ্ইয়ান থেকে মিসর যাওয়ার পথে), তখন সে তার পরিবারবর্গকে বলল, ‘তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি তাথেকে তোমাদের জন্য

কিছু জ্বলন্ত আগুন আনতে পারব কিংবা আগুনের নিকট পথের সন্ধান পাব। ১১. তারপর যখন যে আগুনের কাছে আসল, তাকে ডাক দেয়া হল, ‘হে মূসা! ১২. বাস্তবিকই আমি তোমার প্রতিপালক, কাজেই তোমার জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছ। ১৩. আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, কাজেই তুমি মনোযোগ দিয়ে শুন যা তোমার প্রতি ওয়াহী করা হচ্ছে। ১৪. প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার ‘ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশে সলাত কাযিম কর।’ (ত্ব-হা ২০: ১-১৪)

বললেন, ‘এটা তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সন্ধান বল।’

উমারের এ কথা শুনে খাব্বাব (রাঃ) তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ‘উমার! সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিগত বৃহস্পতিবার রাতে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহল বিন হিশাম এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন) তা কবুল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফা পর্বতের নিকটস্থ গৃহে অবস্থান করছিলেন।’

খাব্বাব (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর উমার (রাঃ) তাঁর তরবারিখানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে সেই বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ উমার দন্ডায়মান রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে তা অবগত করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে হামযাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?’

লোকজনেরা উত্তর দিলেন, ‘উমার বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।’

হামযাহ বললেন, ‘ঠিক আছে। উমার এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি উমারের নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

أَمَّا أَنْتَ مُنْتَهِيًا يَا عُمَرُ حَتَّى يَنْزِلَ اللَّهُ بِكَ مِنَ الْخَزَى وَالنِّكَالِ مَا نَزَلَ بِالْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ؟

“উমার! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?”

তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর সমীপে দু’আ করলেন,

اللَّهُمَّ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

“হে সর্বশক্তিমান প্রভু! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ উমার বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।’ নাবী (ﷺ)-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর উমার (রাঃ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

অর্থঃ ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।’

উমার (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাওহীদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থিত লোকজনেরা এত জোরে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন। আরব মূলুকে এটা সর্বজন বিদিত বিষয় ছিল যে, উমার বিন খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সাহস সেই সমাজে কারোই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা বড়ই লাঞ্চিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি সাহস ও মান মর্যাদা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল। ইবনে ইসহাক নিজ সূত্রের বরাতে উমারের বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন যে, ‘যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলাম যে, মক্কায়, কোন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সব চাইতে প্রভাবশালী শত্রু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর মনে মনে বললাম এ আবু জাহলই হচ্ছে তাঁর সব চাইতে বড় শত্রু। ততক্ষণে তার গৃহে গমন করে দরজায় করাঘাত করলাম। সে বাহির হয়ে এসে (খুশি আমদেদ, খুশ আমদেদ) বলে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল এবং বলল, ‘কিভাবে এ অভাগার কথাটা আজ মনে পড়ে গেল?’ প্রত্যুত্তরে কোন ভূমিকা না করেই আমি সরাসরি বললাম, ‘তোমাকে আমি এ কথা বলতে এলাম যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দ্বীনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমার কথা শ্রবণ করা মাত্র সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ‘আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং যা কিছু আমার নিকট নিয়ে এসেছে সে সবেদও মন্দ করুন। (মোবারকপুরী)

পরিশিষ্ট

- ১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম প্রত্যেক ময়দানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে।
- ২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় দিকে পরিপূর্ণ।
- ৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষকে সভ্যতা ও উন্নয়নের প্রতি আহবান করে।
- ৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মকে সত্য বলে সভ্য জগতের (বহু) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য দিয়েছেন।
- ৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করা অতি সহজ।
- ৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের মূলনীতি হল, সমস্ত নবী-রসূল এবং আসমানী গ্রন্থকে সত্য বলে স্বীকার করা।
- ৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়-বস্তুতে পরিব্যপ্ত।
- ৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে অধিক অধিক সরলতা ও নমনীয়তা বিদ্যমান।
- ৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সাক্ষ্য দেয় নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।
- ১০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল জাতি ও যুগের জন্য উপযোগী।
- ১১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম অনুযায়ী সর্বাবস্থায় আমল করা সহজ।
- ১২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মে অতিরঞ্জন (সীমিতরিক্ততা, অসংযম) ও অবজ্ঞা নেই।
- ১৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবিকল সংরক্ষিত ও অবিকৃত আছে।
- ১৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের ধর্মগ্রন্থ স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে, তা সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ।
- ১৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল প্রকার উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করতে আদেশ দেয়।
- ১৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্তমান সভ্যতার মূল উৎস।
- ১৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার অব্যর্থ ঔষধ হতে পারে।
- ১৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সভ্যতা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সকল বিষয়ে পরিব্যপ্ত।

- ১৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম দ্বারা বিশ্বশান্তি কায়ম হতে পারে।
- ২০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বিজ্ঞান-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ সহজ হতে পারে।
- ২১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সকল মানুষের জন্য অভিন্ন ব্যবহারিক আইন প্রণয়ন করতে পেরেছে।
- ২২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম জাতপাত ও আতরাফ-আশরাফের ভেদাভেদের সকল প্রাচীর তুলে দিয়েছে।
- ২৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সামাজিক ও দাম্পত্য ন্যায়-নিষ্ঠা বাস্তবায়িত করেছে।
- ২৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের প্রকৃতি থেকে দূরে নয়।
- ২৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র প্রতিহত করে পরামর্শ-ভিত্তিক রাজনীতি প্রণয়ন করেছে।
- ২৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শত্রুপক্ষের প্রতিও ন্যায় বিচার ও ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছে।
- ২৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সুসংবাদ দিয়েছে আসমানী গ্রন্থাবলী।
- ২৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম নারীকে মা, স্ত্রী ও কন্যা; তার সকল অবস্থায় যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে।
- ২৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বর্ণ-বৈষম্যের অন্তরাল তুলে দিয়ে শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায় এবং আরব-আজমের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।
- ৩০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শিক্ষাকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয (আবশ্যিক) করেছে এবং শিক্ষা বা জ্ঞান গুপ্ত করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।
- ৩১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করেছে।
- ৩২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্মের সুস্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশাবলী আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুকূল।
- ৩৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম ক্রীতদাসকে পাশবিক আচরণের হাত থেকে রক্ষা করেছে, প্রভুর সাথে সমতার মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং দাসমুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।
- ৩৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম বিবেক-বুদ্ধির স্থান রেখেছে এবং তার যুক্তিকে মেনে নিয়েছে।
- ৩৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম ধনীর নিকট থেকে নির্ধারিত পরিমাণ ধন নিয়ে দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করে ধনী-গরীব উভয়কেই রক্ষা করেছে।

৩৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের প্রকৃতি ও ঐশ্বরিক হিকমত অনুযায়ী এমন আচার-আচরণ বা চরিত্র নির্ধারণ করেছে, যা প্রয়োজনে কঠোর হতে এবং প্রয়োজনে দয়ালু হতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

৩৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সমগ্র সৃষ্টির প্রতি করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে আদেশ করেছে।

৩৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম প্রকৃতিগত ভিত্তির উপর দেওয়ানী আইনের মৌলনীতি প্রণয়ন করেছে।

৩৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিয়েছে।

৪০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম হৃদয়, চরিত্র ও বিবেককে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে।

রেফারেন্স

AlKawsar. (2016, August). বর্ষ: ১২, সংখ্যা: ০৭. Retrieved from https://www.alkawsar.com/bn/article/1844/?fbclid=IwY2xjawOFVvdleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFsYlRKSGh5T3BEWjFBMlJqc3J0YwZhchBfaWQBMAhjYwXsc2l0ZQE3AAEeFQIXb4y97dPYjycAZQA_rcpPo6qMYZas1Vim44gpHnD9q3aDxc1E2jo2TPg_aem_SpQvK2zuI97G_He21xJjpg

আবদুল্লাহ, ম. আ. (2013, April). বর্ষ: ০৯, সংখ্যা: ০৪. Retrieved from Al Kawsar: <https://www.alkawsar.com/bn/article/862/?fbclid=IwY2xjawN76q1leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFlNjNoNF11RW1nTm1BYWhBc3J0YwZhchBfaWQBMAABHkx5C3FWC->

[u9k7MqLcrIiMPoYAKczEQsa8M8S_Qqpj6KknDj_1JAENDTiSZ6_aem_GgQPllsPbPg4nIVE5Kpw3A](https://www.alkawsar.com/bn/article/862/?fbclid=IwY2xjawN76q1leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFlNjNoNF11RW1nTm1BYWhBc3J0YwZhchBfaWQBMAABHkx5C3FWC-u9k7MqLcrIiMPoYAKczEQsa8M8S_Qqpj6KknDj_1JAENDTiSZ6_aem_GgQPllsPbPg4nIVE5Kpw3A)

কোব্বাদী, ম. উ. (2025, July 28). পাশ্চাত্য নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীর মর্যাদা. Retrieved from Muslim Bangla: <https://muslimbangla.com/article/899?fbclid=IwY2xjawOFifZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFsYlRKSGh5T3BEWjFBMlJqc3J0YwZhchBfaWQBMAhjYwXsc2l0ZQE3AAEedPliAktRlQrgb2YOLf-tt8rh9CmBt->

[LwOBr3rzAviC3tY4tMNIHAEzFTLMU_aem_FMknHFR98HKnJBE6wpyXYw](https://muslimbangla.com/article/899?fbclid=IwY2xjawOFifZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFsYlRKSGh5T3BEWjFBMlJqc3J0YwZhchBfaWQBMAhjYwXsc2l0ZQE3AAEedPliAktRlQrgb2YOLf-tt8rh9CmBt-LwOBr3rzAviC3tY4tMNIHAEzFTLMU_aem_FMknHFR98HKnJBE6wpyXYw)

মাদানী, আ. হ. (n.d.). In স্বীনে-ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য (pp. 11-30).

মোবারকপুরী, আ. স. (n.d.). বড় বড় সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণ. In আর-রাহীকুল মাখতুম, তাওহিদ পাবলিকেশন.